বিকেলের শেষ রোদে ঝলসে ওঠে কাস্তে। সমির আলী যখনই ওটার ধারে চোখ রাখতে যাবে, তখনই সেই ঝকঝকে ধারের ফোঁকর গলিয়ে দেখে আজব আলো। সেই আলোর ঘোরে চন্দ্রসূর্য সব ডুবে যায়, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে সে।

মুঠোহাত দিয়ে চোখ কচলায়।

তার মনে হয়, এ লাল রক্ত নিয়ে ঢোল হয়ে মরতে থাকা সূর্যের আলোর বিভ্রম।

সামনে এসে দাঁড়ায় কমলাসুন্দরী।

রসিক ঢঙে পা মুড়িয়ে যেন চরকি নাচন নাচতে নাচতে চোখে কটাক্ষ তুলে চোখের ভাষায় নীরব প্রশ্ন করে— আমারে চিনতাছ না ?

কী করে চেনে সমির আলী, কী করে চেনে ? বুকের ফাঁপরে রক্ত তুলে তুলে যে কন্যাকে সে চিতায় ডুবতে দেখেছে, তাকে সহসা চিনে ওঠা সহজ কথা ? চোখের সামনে ঝকঝকিয়ে থাকা কাস্তেটা সরষে বনের প্রচুর হলুদের মধ্যে মিলিয়ে যায়, সে ঠাটা পড়া মানুষের মতো সম্মুখে দাঁড়ানো নারীটির দিকে চেয়ে থাকে। রূপসী কন্যা সে জন্ম থেকেই। সেই রূপের মধ্যে দক্ষিণের হাওয়া ছিল, প্রভাতের সূর্য ছিল, আসমানের মেঘ ছিল, কিন্তু এত জৌলুস ছিল না।

মাগরিব অক্তের রক্ত রোদের নিচে শনশন করে ওঠে কমলার সাজ। ওকে কোনোদিন কপালে টিপ, চোখে কাজল পর্যন্ত দেখে নি যে সমির আলী, সে জরির বোনা শাড়ি পরা, দুই হাতে অনন্ত বালা, গলায় সোনার চিক, দুই ভুরুর মাঝখানে টিকলি পরা একেবারে রাজেশ্বরী হয়ে আসমান থেকে টুপ করে খসে পড়া কমলাকে কী করে বলে— আমি তুমারে চিনছি।

চিনাচিনি, মাখামাখির দিনগুলোকে সে কবেই চিতায় পোড়া ছাই দিয়ে চেপে চেপে বন্ধ করে রেজিনার সাথে দাম্পত্যজীবন শুরু করেছে। না, কমলার চোখের কটাক্ষে এত ছেনালি বান ছিল না।

সমির আলী পেছাতে থাকে। চারপাশে ধুধু ক্ষেত, গাছপালা, বিরান ঘাসজল, এর মধ্যে গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না সমিরের। সে কী করে আসমান ফুঁড়ে নেমে আসা কমলাসুন্দরীর প্রেতাত্মার মোহ থেকে ফাল দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে!

বাঁশঝাঁড়ের অপর পাশের শিমুল গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে পড়ে থাকে সমির আলী। প্রভাত যায়, মাগরিব আসে। কানে বাজে রাণী কমলার গল্প। একরাতে ফিসফিস কানে, হাতের চুড়ির নড়ন চড়ন শব্দ থামিয়ে, হুনো বাদশা, রাণী কমলার মতন আমিও একদিন অচিন দিঘির শেষ তলায় হারায়া যাইমু। অত প্রেম ভালা না, বাদশা, পরে তুমিও রাণীর স্বামীর মতন জলের সামনে খাড়ায়া খাড়ায়া বুক শুকায়া ফালাইবা। প্রথম দিন এই গল্প আর কমলাসুন্দরীর কথা শুনে ছ্যাত ছ্যাত করছিল সমির আলীর কলজে। অনেক পরে সে অনুভব করে, এ কমলার একটা ছল, অকুল প্রেমে মজলে নরনারী উভয়ই কখনো না কখনো বিচ্ছিন্নতার কথা বলে, মৃত্যুর কথা বলে প্রেমিক বা প্রেমিকার মুখের ছায়ায় জমে ওঠা হায় হায় পরানটাকে দেখতে পছন্দ করে। তবুও, নিভৃত নিঃশ্বাসে সে কমলাকে কখনো রাণী কমলা, কখনো কমলাসুন্দরী এরকম নানা শব্দে ডাকত।

দূর ক্ষেতের রাখাল আর সামনের ধাবমান মুখে ঠুলি পরা গরুদের দেখতে দেখতে যখন মাথা থেকে জাগতিক সরষে ফুল খসে পড়েছে, ভূতগ্রস্ত সমির আলী পশ্চিমের লালিমার দিকে তাকিয়ে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, আসলে কমলা নামের কেউ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় নি; তখন মাঘ শীতের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসা চোখ দিয়ে সমির দেখে, আলের ওপর দু'টি রুপার চুড়ি পড়ে আছে। ছটফট করতে করতে চুড়ি দু'টি হাতে নিয়ে আকুল হাহাকারের তলায় গাপি দিয়ে দিয়ে সমির স্মরণ করে, বাঁশঝাড়ের তলায় কালো নিকষ অমাবস্যার রাতে কমলাকে বুকের একেবারে পাঁজরের সাথে মিশিয়ে সে ওই চুড়ি দুটি আন্ধার হাতড়ে কমলার দু'হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। এইবার সাক্ষাৎ সরষে ফুল, সেই হলুদ ফুল বাতাসের কঠিন তলায় মিশে যায় পোয়াতি রেজিনার ভরন্ত পেট। দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর খায়।

অসাড় পরান ভয়ে রাঙিয়ে এইবার সত্যিই কাঁপতে থাকে সমির, আত্মারা মিলিয়ে যাওয়ার আগে সে যে সত্যিই এসেছিল, তার চিহ্ন রেখে যায়। ভয় কেটে যায়, কষ্ট মিলিয়ে যায়, চৌগ্রামে কমলাসুন্দরীর অস্তিত্ব নেই... তবে এই চুড়ি ?

আলের ওপর বসে চুড়ি দু'টি বুকের মধ্যে চেপে ধরতে ধরতে একেবারে গেন্দাবাচ্চার মতোন কেঁদে ওঠে সমির... ওহ্ হো... হো... কমলাসুন্দরী রে...।

লক্ষ্মীপেঁচা খুব অল্প শীতেই একেবারে ছেঁড়াবেড়া কাহিল হয়ে পড়ে। মরা পিঠে আঞ্চল টানে তো বুক উদুম হয়ে যায়। বুকের কাছটা ঢাকতে যায় তো কোমরের শায়া গিঁট থেকে একবারে ওপরে উঠে এসে কোমরটাকে বেইজ্জতির মধ্যে ফেলে দেয়। তেঁতুল গাছের তল দিয়ে সন্ধ্যার সময় সে পার হতে গিয়ে প্রভাবশালীর চৌদ্দগোষ্ঠিকে শাপশাপান্ত করে। ঘরে এত টাকা, প্রভাবশালীর অলঙ্কার, যেদিকেই দুই নয়ন যায় সেই দিকেই প্রভাবশালীর জমি— সেই প্রভাবশালী কী-না যাকাতের ন্যায্য পাওনাটার মধ্যে দুই নম্বরি করে বসল ? কিনলিই যদি, দশ হাইত্যা কাফর কিন্যা গরিবরে ঠকাস ক্যা ? আরে বেজ্জাইত্যা, তুই মনে করছস, আল্লাহ্ তরে মাল সাইজ করবার দেখব। কাফর দুই হাত কম, হেইডা কি আল্লায় আইস্যা গজ ফিতা দিয়া মাপব ? আরে কিপটা কাউঠ্যার পুত, অহন তরি আল্লার দরবারে মুখ খুলি নাই, ঠিক মতো সেজদায় পৈরা তরে যদি অবিশাপটা দেই, তর গুষ্টির ভুষ্টি শাশ হয়া যাইবে না ? আটকুরার বাচ্চা আটকুরা, কার লাইগ্যা অত জমিন ? কার লাইগ্যা চুরি ? কেডায় খাইব ? না, অবিশাপ দিমু না, খোদার উপরে খুদগিরি করুম না— তর পাপ তর— আমার কী রে ?

এই অনুভবের জায়গাটিতেই বুড়ির নাম জন্মাবধি 'লক্ষ্মীপেঁচা'। সে আগে থেকে অকল্যাণ টের পায়, মানুষকে সাবধান করে। লক্ষ্মীপেঁচা চুবচুবে তেঁতুল পাতার ভুতুরে বিস্তার দেখে। দম নিয়ে এক মনে জিনপরীর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য আল্লাহর নাম জপে, অন্যদিকে দাঁত কিড়মিড় করে অদৃশ্য প্রভাবশালীকে নিজের সামনে এনে দাঁড় করায়, দিমু শক্ত অবিশাপ দিমু। আরে ব্যাটা আমার হাত দিয়া তর জন্ম হইছে, একটা মরমর গেদারে তর মায়ের হুগার ভিত্‌রে থাইক্যা বাইরে আনছি... হায় হায় তহন তর মায়ের কী কান্দন! মাগো, বংশের বাত্তি... বাঁছাও। জিন্দেগিতে এই কাম করি নাই। গেরামের দাইয়ের তহন গুডি বসন্ত। তর বাপে গেছে ডাক্তার আনতে। তর মায়ে কয়, মরমু তবুও পুরুষের সামনে নাঙ্গা হৈমু না। আমি সিদা তর দুই ঠ্যাং দৈরা থাফরা দিতে থাকলাম তর পিডে, আহারে পিতলা ঘুঘু, তর মতন ফৈচ্চকা মাইনসের চক্ষে তহন অঢেল পানি, তর মায় কয়, মাগো, অত ছুড়ু আবুরে থাফড়াও ক্যা ? হেষে কী অইল, থাফরা খাইয়া তুই বাইচ্চা গেলি। হেই আমার লগে তর বিবির চল্লিশার সময় কী করলি ?

ঠাণ্ডা চোখে আরেক ফালি হাসি দিয়ে, তীব্র অভিমান বা রাগে কমলা উলটো পথ ধরে।

মাটির তলা থেকে কী আজীব ঘেরান আসে গো... সমির আলীর মাথায়, মনে সর্বাঙ্গে সেই ঘেরান ছড়িয়ে তাকে নিথর করে তোলে। সরষে ফুল তো নয় ফ্রক পরা অনেক অনেক খুকি পরী। আলের ওপর বসে সমির আলী শুধু দ্যাখে আর দ্যাখে। পোয়াতি বউয়ের সরষে শাক খাওয়ার লালচ জন্মেছে, আসলে বউ তো নয়, পেটের ভেতর বসে আবদার ধরেছে ছোট্ট আবুটিই... বিষয়টাকে এইভাবেই বোঝে সমির আলী, যেহেতু গর্ভে সন্তান আসার আগে রেজিনার সে-কী লালচ, পোড়ানো কাঁঠাল বিচি ভর্তা করে খাওয়ার প্রতি। সেই মেয়েই কী-না পেটে আবুটা আসল কী আসল না সময়ে, কাঁঠালের পোড়া বিচি দেখে বমি উগড়ে দিল!

রেজিনার খাওয়ার মূল বিষয়গুলো আবু আসার পর পালটে গেছে। আগে যা পছন্দ করে খেত, তাতেই বমি। এদিকে দুইচক্ষে দেখতে পেত না যে জাম্বুরাকে সেটাই হয়ে উঠল তার সবচাইতে আদর সোহাগ কদরের খাদ্য। সমির আলী এতে কী বুঝবে ? যে সরষে শাক কাটতে গিয়ে তার বুকে ঝিম ধরছে, সেই শাক কি আদৌ রেজিনা খেতে চাইছে ? পেটের শিশুর আবদার বলে কথা, সমির আলীর ক্রমে ক্রমে ভাবালুতা কমে যেতে থাকে। সে কাস্তে খুঁজতে গিয়ে টের পায়, বুকের মধ্যে বল্লম গেঁথে দিয়ে গেছে কেউ। সে অদিশার মতো খাঁখাঁ ভূমি থেকে চোখ বাড়ায় কমলার হেঁটে যাওয়া পথের দিকে। ওই তো রঙিন বাতাসের পোংটামি ঘিরে ধরেছে ওই অদুনা রমণীকে। আঁচলের লাল আর সূর্যের লালের মধ্যে গিঁটঠু লেগে গেছে।

মাথায় ঠুনডা মেরে সে ফের কাস্তে খোঁজে। সরষে বনের হলুদ বাতাস ওটাকে গিলে ফেলেছে। লুঙ্গি মালকোচা অবস্থায় আলের মধ্যে ধপাস করে বসে সমির আলী টের পায়, তার চোখ মাথায় কিসসু কাজ করছে না। আসমান থাইক্যা উড়াল দিয়া নাইম্যা আওয়া কন্যা কমলা ?

সে এই পৃথিবীর কোথাও আছে, সে মরে নাই... প্রাণের উজানে এই বিশ্বাসটাই ধকধক করে উঠত সমিরের, কিন্তু কমলার অসহায় পিতা রামদাসের দুর্দশার কথা ভেবে সে তার ভেতর প্রায় বদ্ধমূল হয়ে থাকা এই বিশ্বাস কোনোদিন প্রকাশ করে নি। শুধু সেই জন্য নয়, সেও মনে প্রাণে রক্তেমাংসে এ-ই বিশ্বাসই করতে চেয়েছে— কমলাসুন্দরী মৃত্যুলোকে চলে গেছে।

নইলে তখন সমির আলীর যা দশা ছিল, ইহজীবনে অন্য কোনো নারীর সাথে সংসার করার বিষয়টা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারত ? যে কাদামাটির শরীরের সাথে, ঘেরানের সাথে, অস্ফুট টরে টক্কা মৌজের সাথে জড়িয়ে যায় আসমানের

পরী, যে পরীর গভীর সান্নিধ্য সমিরের মধ্যে নিজেকে রাজপুত্র মনে করার বোধ দিয়েছিল, তাকে জীবন থেকে, এই ত্রিচরাচর থেকে বাদ দেয়ার কথা মৃত্যুর বিনিময়ে সমির ভাবতে পারত ? অথচ যে দিন কমলা চলে যায়, তার আগে গভীর রাত্রে তারা বাঁশঝাড়ের তলায় নিশ্চুপ আলিঙ্গনে লিপ্ত হয়েছিল... তখনো একবারের জন্য কমলা সেই কম্পিত দেহ, অতল চক্ষু, আন্ধারে বিস্তারিত হাত কিছুতে যে চির বিদায়ের চিহ্ন রাখে নি, কাঁধে আঁচল তুলে কমলাসুন্দরীর সেই চিরায়িত ঢঙে হেঁটে যাওয়া, কিছুর মধ্যে সমির আলী কোনোরকম বিদায়ের একবিন্দু আলামত খুঁজে পায় নি। আসমান-জমিন সাথে রেখে ওরা দুজন দুজনকে বুকে নিয়ে প্রথমে জ্বলে ওঠে, পরক্ষণেই নিরবল পড়ে থাকত ঘণ্টা ঘণ্টা... সব আব্রু খুললেও কোনোদিন কমলা কোমরের গোড়া খুলত না, বলত— এইডাই নারীর সব। ভগমান, মা দুর্গারে সাক্ষী রাইখ্যা তয় ওই কবাট খুলতে হয়।

যেদিন প্রভাতে কমলা নিরুদ্দেশ হয়ে একেবারে বাতাসের সাথে মিশে যায়, সেই রাতেও আসমান-তারা সাক্ষী ছিল ওদের প্রাণমিলনের মধ্যে, সেই দিনও উজানি তুফানের মতো ধেয়ে উঠতে থাকা কালো শক্ত শরীরটাকে মিঠা চুমোয় নিথর করে দিয়ে কমলা বলেছিল— না!

এরপর চৌগ্রামের মানুষ যখন কমলাকে খুঁজছে, পাড়ায় ঢিঢি পড়ে গেছে, গ্রামে আসা নতুন দুই যুবকের সাথে কমলা শহর পথে পাড়ি দিয়েছে, সমির আলীর কলজে আত্মাকে ফালি ফালি কেটে যেন তার মধ্যে সাত আসমানের আগুন ঢুকিয়ে দেয়। দিনের পর দিন গেছে তার অকেজো আর পঙ্গু হয়ে।

সে-ই যদি গেল, পরানের মানুষঢারে সব উজাড় কৈরা দিয়া গেল না ক্যা ? কমলাসুন্দরীর যে দেহডারে অহন শহরের দশ শকুনে ছিঁইড় খাইব, সেই দেহরে পাক পবিত্র রাখার খায়েশ তো সমিরের সাথে শেষ মিলনের লগেই শ্যাষ হৈয়া যাউনের কতা। তয় ?

যেন নিজের হাতে একটা ডালিমকে কুঁড়ি থেকে রক্ত বর্ণ করার পর যেই সে ডালিমের খোসা ভাঙতে যাবে, তক্ষণি ছুঁ দিয়ে তাকে শকুনে উড়িয়ে নিয়ে গেল। অর্ধ বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো বেহাল সমির আলী, বাঁশঝাড়ের যে জায়গাটায় ওরা মিলিত হতো সেই মাটির ঘেরান শুঁকেছে, সেই মাটি জিহ্বায় তুলে অক্ষম ক্রোধে বুতুর বুতুর করে উঠেছে, মনডারে আর দেহডারে আলাগ করলি ক্যা সুন্দরী ? অহন তর ভগমান, দুর্গা কই ?

বাঁশ মাথায় বাতাসের কামড়া কামড়ি খেলা। এর মধ্যে একটানা গেয়ে যায় ঘুঘু। সামনের খেজুর গাছের ওপরের ঝুলন্ত পাখিঘরে কিচকিচ করে বাওলারা।

একটু দেরি কৈরা আইছি, য্যাফত খাইমু, পেট ভৈরা গুশত খাইমু, আমার নাতনির অহন তহন অবস্থা। কুন পুরুষ বাড়িত নাই। কী বেদিশা আমার দশা। হেষে সেলাইন খাওয়াই ভালা করলে মাইয়ায় কয়— আমি গুশত খাইমু। বেবাক গুছায়া আমি তর বাড়িত গেলাম সিনা টান কৈরা। নিজেও খাইমু, নাতনির লাইগ্যাও আনমু। গুলামের পুত তুই গুশত তো দূরের কতা, একটা হাড্ডিও রাখলি না আমার লাইগ্যা। গাছের নিচে একটা ছায়া। সর্বনাশ! এটা মাড়িয়ে গেলে তেনারা দল বেঁধে এসে লক্ষ্মীপেঁচার মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে। গা ঘষটে ঘষটে আগোতে থাকলেও লক্ষ্মীপেঁচার তেজের উপশম হয় না। সে এরমধ্যেই ভুসুর ভুসুর করতে থাকে— আমারে তুই কইলি গুশতের সালুন তো শ্যাষ দাইমা, তুমি ইটটু তাড়াতাড়ি আইবানা! বাত আছে, তুমি একটু গুশতের সিরা দিয়া খাইয়া লও।

ঝাড়ু মারি তর গুশতের সালুনে। দেরি হৈছে তো কী হৈছে ? আমার লাগি আলগা কৈরা কিছু সালুন রাখবি না ? আমারে তুই রাস্তার ফকিন্নী পাইছস ? আমিও কইলাম তেন্দরের পুত, ছাড়ুম না তরে, আমার জেদের বাত কুত্তায় খায়, বলতে বলতে বুড়ি যেই ঊর্ধ্বপানে লাঠি উঠাতে যাবে... সামনে অপরূপ সাজে সজ্জিতা কমলাসুন্দরী।

বুড়ির থরথর হাত থেকে লাঠি খসে পড়ে। লক্ষ্মীপেঁচার থরথর কাঁপুনি দেখে আজিব ভেলকিবাজির হাসি দেয় সে মেয়ে। লক্ষ্মীপেঁচাকে তমস পানির ঘাইয়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে কমলা অনেক দূর চলে যায়।

তেঁতুল গাছে ঝিরঝিরে বাতাসের চুড়ির শব্দ। লক্ষ্মীপেঁচার নড়ার শব্দ নাই। মনে হয় দেহটা মাটি ফুঁড়ে অতল গহনে তলিয়ে যাবে।

আইজকার হাঞ্জাডা এইরকম ক্যা ?

লক্ষ্মীপেঁচার কলজে চিপিয়ে এই প্রশ্নটি উত্থিত হয়, হাঞ্জা আর লহুরইদ এক জাগাত খাড়ায়া রৈছে, কেউর মাতাত রাইতের চিন্তা নাই...

লক্ষ্মীপেঁচা কমলাসুন্দরীর চলে যাওয়ার পথে বোদাইয়ের মতো পায়ের ছাপ খোঁজে। শুকনো আর সবুজ বাতাসে খাড়াপথ আকীর্ণ... ওর মধ্যেও যদি একটু দাগ মেলে ? বানরের মতোন হামাগুঁড়ি দিয়ে, দমটাকে গলায় আটকে রেখে লক্ষ্মীপেঁচা এগোতে এগোতে খোঁজে, তেনাদের পায়ের কোনো ছাপ পড়ে না মাটিতে... লক্ষ্মীপেঁচা উদ্‌ভ্রান্তের মতোন ভাবে— টাসকী মারা ব্যাফার, পথটা তো কম লাম্বা না, এর শব্দ্যে মায়াডা টপ কৈরা মিশ্যা গেল ?

বাকরুদ্ধ লক্ষ্মীপেঁচা হাতড়ে লাঠিটাকে খোঁজে। এই তো, কমলার ঠ্যাংয়ের গোড়ালির কাছটায় মাটিতে লাঠিটা খসে পড়েছিল। লাঠি ছাড়া তার দণ্ড হাঁটা চলে না। তাজ্জব চোখে, সাঁতারের মতন দুই হাত ছড়িয়ে দিতে দিতে তেঁতুল

তলার রক্ত আলো বাতাসের ফরফরানির মধ্যে আধপাগলার মতোন সে লাঠিটা খোঁজে... তাইলে কি কমলাসুন্দরীর জিনই আমার লাডি লৈয়া গেসে— লক্ষ্মীপেঁচা ফলশা পাতার মতন কাঁপতে কাঁপতে উচ্চারণ করে— লাইলাহা ইল্লা আন্তা...।

বেদম ভাবনা তুফানের আগে চলে। সমিরের ভেতর মুহূর্তে মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে উঠছে শৈশব কাল থেকে যৌবন পর্যন্ত গড়ানো তার সাথে কমলার দিনগুলো। যেটা ভেবেছিল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলবে না, সেটা মুছে প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে তাচ্ছিল্যে ফেলে যাওয়া ক্ষুদ্র কাণ্ডে ভরা মুহূর্তগুলো। স্ফীত তুফানের তোপে পড়েও সমির আলীর তন্দা ভাব কাটে না। গলা থেকে পা পর্যন্ত নিথর, মাথার মধ্যের তারাবাতিগুলো ধিকধিক জ্বলছে। কমলাসুন্দরী জিনপরী নয়, তারই বাহু তলাকার রোম শুঁকে শুঁকে বড় হওয়া মেয়ে। চুড়ি দেখে সে যে জিন ভেবে একই সাথে ভয় আর আত্মহারায় মেতেছিল, এ নিজেকে ভোলানোর খেলা। কমলাসুন্দরী এই গ্রামে এসে বেঁচে থাকবে, আর সে তুফান জ্বরে পুড়তে রেজিনার গতরের ওপর নিজেকে বিছিয়ে দেবে, এ-ও সম্ভব হবে ? কমলার অন্তর্ধানের পর কিছুদিন সমিরের ওপর দিয়ে কী দুঃসহ দোলাই মোলাই না গেছে! শেষে গ্রামবাসী যখন নিশ্চিত কমলাসুন্দরী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গ অথবা নরকে গেছে, তখন সমিরের নিষ্কৃতি! আর নিষ্কৃতিই বা কী করে বলে, কমলাকে কেন্দ্র করে তার ওপর যা নির্যাতন, তা তার অসাড় পিঠের ওপর দিয়েই গেছে। সেই নির্যাতনের সময় তার মন আকুলিবিকুলি করত, আহারে, মাইরডা আমার কইলজার মধ্যে দিয়া গিয়া আমার পরানডারে যুদি দ্যাতড়ায়া দিত ?

যৌবনে উঠি উঠি সময় থেকেই কমলাসুন্দরীর গ্রামের মানুষদের মধ্যে তাকে নিয়ে ফুসুর গুজুর। কমলা হিন্দু, সমির মুসলমান... শৈশবের বিষয়টা আলাদা, দুইজন এক সাথে হেসে খেলে বড় হচ্ছে, এ আর দোষের কী ? কিন্তু যৌবনে কীসের অত মাখামাখি ? তখন দুজনের মধ্যে এক সাথে পাগল প্রেমের বাতাস বইছে, এক দণ্ড না দেখে বাঁচন যায় না... কমলা যত বলে, লও সাবধান হই... তত কমলার প্রতি সমিরের আকর্ষণ বাড়ে।

এইভাবে পরানের মরণটান বুকে বেঁধে সমির বেত দিয়ে ঝুড়ি বানায়, হাতপাঙ্খা বানায়, নৌকা বানায়... আর যখন টের পায়, গহন রাতে একটা ঝিঁঝি

পোকাও জাগনা নেই, তখন কীসের তুফান টানে যে সে এসে অন্ধকার রাণীর চরণ তলে এসে বসে। এই টান কোনো সাধারণ সহজিয়া প্রেমের টান নয়। তার এমনও মনে হয়, কমলাসুন্দরী তাকে বশীকরণ তাবিজ দিয়ে বেঁধেছে। গ্রামের সব লোকের ছোঁক ছোঁক লাল চোখকে উপেক্ষা করে কেন যে কমলা জীবনের জন্য সমিরকেই গেঁথে নিল এটা ভেবে এখনো কূল-কিনারা করতে পারে নি। প্রভাবশালীর বাড়িতে কাজ করে রামদাস, বলা যায়, যুগ যুগ ধরে সে ওই পরিবারের সাথে আছে। প্রভাবশালীর চোখের সামনে দিয়েই বলা যায় কমলা যুবতী হয়েছে। পাড়ার যুবকগুলো এমন অসহায় চোখে কমলার দিকে তাকিয়ে থাকত, যেন হাত-পা বেঁধে ওদের সামনে পাকা কাঁঠাল রেখে দেয়া হয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলেই ভেঙে খেতে পারছে না, যেহেতু তারা বুঝে গেছে স্বয়ং প্রভাবশালীর নীরব টার্গেট হয়ে উঠেছে কমলা। সমিরের সাথে কমলার ছোটকালের দোস্তি, সবার সামনে ওদের একত্রে চলার বিষয়টা দিন দিন সয়ে আসছিল। হলে হবে কী, দুজনের বাড়ন্ত বয়সে কমলার ভরা যৌবনের ডাকে সারাক্ষণ নেশার গাদায় বুঁদ হয়ে থাকা সমিরকে কমলার জীবন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই করে ফেলা হলো। গ্রামে এই কাণ্ড এই রকম হিন্দু-মুসলিম প্রেমের কারণেই যে শুধু ঘটে তা নয়। গ্রামবাসীর মতে, অবিবাহিত দুইজন নরনারীর যে-কোনো সম্পর্কই পাপের সম্পর্ক। নাজায়েজ সম্পর্ক। এই গ্রামে খুব কম জনই তার প্রণয়ের সাথিকে বিয়ে করতে পেরেছে। দেখা গেল, পাত্রীর পরিবার, বংশ, সব ভালো, দেখতেও ভালো এমন ঘটনা ঘটেছেও পূর্ব বাড়ির জব্বারের ক্ষেত্রে। ওর বাবা ছেলের মাথায় ত্যাজ্য পুত্রের ঘূর্ণি উড়িয়ে বলেছে— আরে চ্যাংড়া, পিরিতে মইজ্জা ভালামন্দের ভেদ ভুইল্যা গেছস ? মাইয়া যুদি ভালাই অইত, তয় তর লগে হেয় পিরিত করত ? আমার পুত হৈয়া তুই ক্যামনে ম্যাদা মার্কা হস! ওইসব কমিনের ঝিরা যৌবন লৈয়া বেকায়দায় পড়ে আর বিয়ার আগেই তগোর মতোন বোদাই মরদের লগে মিইশ্যা যৌবনের স্বাদ মিডায়। কুন ভালো পরিবারের মাইয়া বিয়ার আগে পিরিত করে ? কুন দিন না!

যথারীতি জব্বারের অন্যত্র বিবাহ হয়।

এই যে গ্রামের চেহারা সেখানে মধ্যরাতে কাকপক্ষী নীরবতায় দুজন মানুষ যতক্ষণই নিজেদের কান্না-হাসির বেদনায় চক্কর খেত ততক্ষণই তাদের কলজের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা দুমদুম ভয় হয়ে তাদের সমস্ত সত্তার মধ্যে ধুকপুকানি শীত ঢুকিয়ে দিত।

একদিন প্রায় ভেঙে পড়েছিল কমলা— গোপনে গোপনে আর পারি না, আমারে গরে তুইল্যা লও!

কী কও তুমি কমলা ? গরে তুলুম তুমারে ? ক্যামনে ? গেরামবাসী আমাগো কইলজা দুইডারে খুইল্যা তুর্কি নাচন নাচব না ?

সমির আলীর শার্ট খামচে ভয়ে-আতঙ্কে কেঁদে উঠেছিল কমলা। তাইলে ? এই যে দেহা, এই যে মিলন এর বেবাকই এমনি এমনি ? বেবাকই দুইদিন একলগে চলা ? আর হারা জীবন ?

না কমলা, না... সিনার তলে যতদিন জান আছে, তুমারে লৈয়াই জীবন, তুমারে লৈয়াই মরণ!

ক্যামনে ?

কমলার এই প্রশ্নের সামনে সমির দেখে বিশাল বিশাল চর, খাঁখাঁ উত্তপ্ত ধুলা, মেঘের পর মেঘ আর কঠিন অমাবস্যা। সমির সেই পরতের পর পরত আন্ধারের এক ফালিতে ঢুকে পড়ে বলে— তুমারে লৈয়া আমি পলাইমু।

কিন্তু সব শেষে কী হলো ?

সব খানখান!

সব গুঁড়া গুঁড়া!

যে সমির আল্লাহর কোরআন নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কমলাকে না পেলে হয় সে আত্মহত্যা করবে, নয় সারাজীবন একলা থাকবে, এই জীবনে সে কমলা ছাড়া কোনো নারীর দেহ ছোঁবে না— সেই সমির আলীর বছর না ঘুরতেই বিয়ে হয়, পর বছরে বউয়ের পেটে আবু হয়। সমিরকে কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করতে আসবে না। কমলা তো আরো না। যেহেতু সমিরের মুখে উত্তর তৈরিই আছে, তুমি যদি আমারে ছ্যাকা দিয়া শহরের বেগানা পথে পা বাড়াইতে পার—

কিন্তু বিষয় সেটা না। আজ এই ওপরে আসমান, নিচে হলুদ বনের জোয়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মনের মধ্যে জনম আন্ধার ঢুকে যেতে থাকে। কমলা তো কোনো প্রতিজ্ঞা করে নি। করেছিল সে। আজ যদি সে একা থাকত, নিজের সমস্ত তেজ নিয়ে দাঁড়াতে পারত কমলার সামনে— সমির হেইদিন পিরিত গদগদ ভাবের কতা কয় নাই। সেই নিঃশব্দ দংশনের জ্বরে পুড়ে খাক হয়ে যেত কমলার আজকের রূপসী জৌলুস। সেই দিন প্রতিজ্ঞার সময়ও কমলার চোখে সমির আলী ঘোর অবিশ্বাস দেখেছিল, ভাবটা এমন, পুরুষগো আমার দেহা আছে, বউ মরলে চল্লিশ দিন দৈরা কব্বরে বাতাস করে, কব্বর হুকাইলে ফের বিয়া করব।

আজ এমন মনে হচ্ছে, তার সামনে গ্রাম ছেড়ে তিন বছর উধাও হয়ে থাকা কমলাসুন্দরী যদি বেশ্যা হয়েও গিয়ে থাকে, তাহলেও সমির আলী চোখ তুলে অত তীব্রতা নিয়ে কমলার চোখের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, যতটা হাঞ্জার সময় তেজ নিয়ে জৌলুসময় কমলা কিছুক্ষণ আগে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রেজিনার পেটের আবু সরষে শাক খেতে চেয়েছে, সরষে ফুলের বড়া খেতে চেয়েছে, যে সরষে কিছুদিন পরই তেলে রূপান্তরিত হবে তার ডগায় কাস্তে কেন আঙুল দিয়ে

একটা ফুলের পাপড়ি তুলে নিতেও অন্য সময় হলে সমিরের জানের মধ্যে পাগ উঠত। কিন্তু নিজের সন্তান বলে কথা... কাস্তে খুঁজতে গিয়ে নিজের মধ্যে সমির আলীর অবর যবর গিঁটঠু লেগে যায়, সে হঠাৎ এই মুহূর্তে তার উদোম গতরের লহুতে লহুতে, কলজের মাঝের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে— কোথাও স্ত্রী কিংবা সন্তানের প্রতি কিচ্ছু মাত্র মায়া খুঁজে পায় না। যে কমলা তাকে বিরান ভূমিতে রেখে দূর পাতালে উড়ে গিয়েছিল, প্রথম বছরের আধপাগলা অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর তার যখন থিতানো জীবনের আরম্ভ— সেই জায়গায় এসে বসেছিল রেজিনা। মাঝে মাঝে বুক চেরা দীর্ঘশ্বাস যে উঠত না, তা নয়। বহু বহু দিন সে রেজিনার সাথে বিছানার সম্পর্কে গিয়ে ঘোর অতৃপ্তির জ্বরে ভুগে খাঁক হয়েছে— যদিও একদিনের জন্যেও কমলার দেহের ভেতরটায় নিজেকে উজাড় করে ফতুর করে দেয়া যেত! এই লোভ বড় মারাত্মক! স্ত্রী সঙ্গমের পরও উবাশ সমির গতরে গতরে অনুভব করেছে, এই জীবনে এই লোভ যাওয়ার নয়।

কিন্তু আজ শুধু কমলাসুন্দরীর দেহ নয়, আস্তটা অস্তিত্ব নিয়েই কমলা তার মধ্যে ছিল— এই অনুভব প্রবল হলে তার মধ্য থেকে স্ত্রী রেজিনা ওর পেটের আবু— কমলার আগমনের সাথে সাথেই সব ছায়ায় মিশে যায়, সে বোধ করে যে আসলে কাদাবালি দিয়ে স্রোতস্বী নদীর বাঁধ দিয়ে নিজের সাথে নিজেকে ভোলানোর খেলায় মেতেছিল।

সরষে বনের একেবারে শিথানে কুদ্দুস মিয়ার ছায়া। সমির আলী ই ই ই...। কাস্তে খোঁজা বাদ দিয়ে সে তেমনই খালি ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে উত্তর দেয়— ও... ঔ... ঔ।

ইদিকে আও... কুদ্দুস হাত ইশারা করে।

নাহ সমিরের দেহে একরত্তি নড়ার শক্তি নেই। নিজেকে যত টানাটানি করে তত কমলাসুন্দরীর অপরূপ সাজ তাকে আলের মধ্যে দাবিয়ে রাখে। আজ হঠাৎ কুদ্দুসের অত আকুল পরান ডাক কেন? কমলাসুন্দরীর বিষয়টা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে? ভীত কণ্ঠকে যতটা সম্ভব উজানে উঁচিয়ে সমির আলী উলটো হাতছানি দেয়— তুমি আও...।

আলপথ দিয়ে টেরি কেটে কেটে কুদ্দুস আসছে।

রামদাসের বাড়ির কাছেই কুদ্দুসের ঘর। নাহ্। কমলাসুন্দরীকে নিয়ে কিসসু শুনতে চায় না সমির। এ বড় সর্বনাশা আগুন। একবার পুড়িয়ে খাক করেও শান্তি হয় নি। সমির আলীকে সে ফের দাবানলে ধাক্কা দিতে এসেছে। সেই দিন সমির আলী একলা পুড়েছিল। আজকের দহনে তার বউ-বাচ্চা সব পুড়ে সাফ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও জিহ্বার ওই পাড়ের আলজিভে থিকথিক কৌতূহল। এতকাল কোথায় ছিল কমলা? সমির আলীকে ভুলে ছিল? তারও ভেতরকার ধুকপুক আকাঙ্ক্ষা— ও কি এখনো সতী আছে?

আলের ওপর বসে কুদ্দুস কষে বিড়িতে টান দেয়।

সাথে আরেকজনকে পেয়ে সমির আলীর বুকের ভার অর্ধেক কমে যায়। সে বোন্দার মতো কুদ্দুসের নীরবতার দিকে চেয়ে থাকে।

হাঞ্জা অকতে গাছের গলায় কাঁচি চালাই বি? কতক্ষণ পর এই প্রশ্ন করে কুদ্দুস বলে, এর লাইগ্যায় তর গরে লক্ষ্মী আয়ে না, তর বরকত অয় না।

কমলাসুন্দরীকে জ্যান্ত দেখে আসা কুদ্দুস একেবারে নিঝঝুম গলায় এসব কী কথা বলছে? কমলাসুন্দরীকে নিয়ে সমির আলীর দশাটা গ্রামের পুকামাকড়েরা পর্যন্ত দেখেছে। কুদ্দুস তো আর জানে না, সমির আলীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কমলার। সে আকথা কুকথা ভালো কথা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আগে সমিরের মনের অবস্থা হয়তো মাপতে চাইছে। কমলাসুন্দরীর সমস্ত বিষয় একমাত্র কুদ্দুসই জানত। কুদ্দুসের মধ্যস্থতায়ই চিঠির আদান-প্রদান। কত কত রাত, কমলা তার জীবনে থাকার সময়ই, এই সম্পর্কের রূপ আর পরিণতির কথা ভেবে কুদ্দুসের পাশে গাঙের পাশে শুয়ে সমির আলী লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলেছে, কেঁদেছেও। এরপর ওপর আসমানের দিকে চেয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে, হে প্রভু! আমি যেমুন আমার মায়ের গভভ থাইক্যা জনম লৈছি, কমলাও তা-ই। দয়াল আমারেই তুমি খালি নিজের হাত দিয়া বানাইছ? কমলারে নয়?

ওর পিঠে হাত রেখে রেখে কুদ্দুসও আসমানের তারা-চান্দ দেখতে দেখতে বলেছে— তোগোর মিলন হৈব। আমি চান্দের মদ্যে পষ্ট দেখতাছি তর আর কমলার মিলন দিশ্য।

যে চাঁদে মানুষ তো মানুষ কোনো একটা ঘাসের ছায়া পর্যন্ত নেই, তার মধ্যে কোন স্বপ্নে যে কুদ্দুস সমির আর কমলার ছায়া দেখে! ঘাসের ওপর শুয়ে সেই দৃশ্য সমির আলীও দেখতে চায়।

আরে বোদাই, তুই অহন জমিনে পৈরা আছস, তুই আর অন্য জাগা ক্যামনে দেখবি? যদি কমলা তরে ছাইড়া চান্দে একলা থাকত, তাইলে তুই তারে দেখবার পাইতি। পানি আর আয়না ছাড়া মাইনষের কী সাধ্যি, নিজেরে দেহে? এক কমলাসুন্দরীকে ঘিরে কী কঠিন দোস্তিই না হয়েছিল কুদ্দুসের সাথে! রাধার বাড়ির কুত্তাটাকে দেখলেও নাকি কৃষ্ণের ভালো লাগত। কিছুতেই সে কুদ্দুসকে ওই পর্যায়ে এক তিল নামিয়ে দেখে নি। কিন্তু তারপরও, কুদ্দুসকে দেখা মাত্র ওর মরা লহুতে শিহরণ বয়ে যেত। এই মরা গেরামে কুদ্দুসই ছিল সমির আলীর জানি জান দোস্ত। কুদ্দুস আসা মানে কমলার চিঠি, কুদ্দুস আসা মানে কমলাসুন্দরীকে কেমন সে দেখে এসেছে সেই বৃত্তান্ত, কুদ্দুস আসা মানে নিজের সমস্ত আনন্দভার ওর চরণে ঢেলে সমির আলীর নির্ভার হওয়া।

amarboi.com

কমলা চলে যাওয়ার পর সেই কুদ্দুসই এক সময় সমির আলীর কাছে তেতো হয়ে উঠল। সমির আলী রেজিনাকে বিয়ে করে পুস্কুনীতে বোরের পর বোর দিয়ে নিজের সমস্ত দেহমন থেকে কমলাকে মুছতে চেয়েছে। তখন স্থিত হওয়ার মুহূর্তে কুদ্দুস মানে কমলাসুন্দরীর আরেক রূপ। যে রূপকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বুকের মধ্যি নাওয়ের লগির খোঁচা এসে লাগা। রীতিমতো অপমান করে সে কুদ্দুসকে তার বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছিল।

আশ্চর্য কুদ্দুসের গুণ! ও যেন সমিরের দেহমনের কোষের পর কোষ চিনত। সে সমির আলীর অনুভূতির একদম ভেতরটার বেদনাকে উস্কানি দিতে পারতপক্ষে বহুদিন ওর সামনা সামনি হয় নি।

মাঝে একটা কোন্দলের মধ্যে পড়ে পুনরায় খাতির। প্রভাবশালীর বাড়িতে কুদ্দুস দিন কামলা হিসেবে কাজ করে। তারও আগে থেকে কাজ করে বুড়া লাঠিয়াল। এই গ্রামে তার মেজাজের গরমে দেহাতি মানুষ তো বটেই, প্রভাবশালী পর্যন্ত তোয়াজ করে চলে। কোনো একটা শক্তি তার আছে বটে, নইলে ভূস্বামীদের যে ক্ষমতার জোর, এক ফুঁয়ে তাকে উড়িয়ে দিতে পারত। কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তাকে চেতালে সেইদিন তার চৌদ্দপুরুষের খবর হয়ে যায়। সে একসময় প্রভাবশালীর শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল ছিল। তার লাঠির এক আওয়াজেই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ত পোকামাকড়ের মতন মানুষ। প্রভাবশালীর বাড়িতে খেটেই সে এক ফালি জমির মালিক হয়েছিল। ঠিক যেদিন সে জমিটার পুরোদস্তুর মালিক হয়, সেই দিন সন্ধ্যায় সে প্রভাবশালীকে বলে, পশ্চিম পারের বড় আইলটার মধ্যের যে জমিটায় গোছাগোছা ধান জন্মে, সেটা কেনাই তার একমাত্র খোয়াব। সেই খোয়াব পূর্ণ হলেই সে জীবনে আর লাঠি ধরবে না। সেই রাতেই, সে ঘুমিয়ে ছিল প্রভাবশালীর কাচারি ঘরটায়, সে স্বপ্নে দেখে ইয়া লম্বা পাকা দাড়ি, হাতে তসবি এক মানুষ তার দরজায় এসে এক গ্লাস পানি চাইছে। সে দৌড়ে কলসির ধারে যায়। কলসি শূন্য। সে আন্ধার উঠোন পার হয়ে পুস্কুনিতে যায়, পুস্কুনিতে শুধু থকথকে কাদা, পানির চিহ্ন মাত্র নেই। সারারাত ধরে সে কী চৈ চৈ তড়পানি! আহারে জল তেষ্টায় এতক্ষণে নিশ্চয়ই দরবেশ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে শূন্য জগ নিয়ে নিজেকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে দরবেশের সামনে এসে বসে। দরবেশ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলে, তুই তর সব কাপড় খোল।

সে খোলে।

দরবেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে— তর লাডির বাড়িতে যারা মারা গেছে, তাগোর রক্তে তর কলসি ভৈরা যাইব, পুস্কুনি ভৈরা যাইব। হের লাইগ্যাই সব পানি সইরা যাইতাছে। পুস্কুনি অহন রক্তের অপেক্ষায় আকুল। দিনের বেলা যে পানি তুই পুস্কুনিতে দেখবি, হেইডা রক্ত। জগতের ধাঁধায় অন্ধ হয়া তুই অর

মইদ্যে পানি দেখবি। তর লাডির বাড়িতে যত মানুষ মরছে, তারা তর মতন উদাম হইয়াই কব্বরে অপেক্ষা করতাছে, তুইও যা!

আমারে বাঁছাইন হুজুর, এই জনমে আমি আর লাডি হাতে নিমু না।

দরবেশ অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে বলে, তর যতখানি জমি আছে, তাতেই সোনার ফসল ফলব। জমির লুভ বড় খারাপ। আর লুভ করিস না। আর মরণের আগ পর্যন্ত কোমরের নিচে খালি এক টুকরা ল্যাঙট পৈরা থাকবি, তাইলেই মরহুমেরা তর উপরে থাইক্যা তাগোর অবিশাপ তুইল্যা নিব।

এত যে তেজস্বী লাঠিয়াল, চৌগ্রামের মানুষ যাকে সীমার নামে ডাকত, ঘুম ভাঙার পর তার সে কী আথারি বিথারি কাঁন্দন... সব বৃত্তান্ত প্রভাবশালীকে বলে সে এক কাপড়ে বিদায় হয়। এই লাঠিয়ালকে যথেষ্ট তোয়াজ করে চলত প্রভাবশালী। তার এহেন গতিক থেকে প্রভাবশালীর আসমান থেকে পড়ার দশা। এরমধ্যে তলায় তলায় একটা বিশ্বাস ছিল, স্বপ্নের কুহক কাটার পর ঠিক ঠিক সে ফিরে এসে লাঠি হাতে নেবে। লাঠিয়াল যার মাথা টার্গেট করে, তার মাথা পরক্ষণেই দুই ফালি। ক্রমশ মানুষের মাথা বাদ দিয়ে একটি বিষয়ের দিকেই সে দিনের পর দিন তাক করেছিল, পশ্চিমের আলতাফ মাস্টারের পোয়াতি জমিটা। এইখানে এসে লাঠিয়ালের মতোন সিনা টান মানুষ পরাজিত হবে ? এ-ও অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতে হবে প্রভাবশালীকে ?

বিশ্বাস করতে হলো। গৃহ-সংসার ত্যাগ করে অশ্বত্থ গাছের নিচে ল্যাঙট পরে এখনো বিড়বিড় করে লাঠিয়াল। এখনো জমির সেবা করে। মেজাজটা ছাড়া তার জীবনের সবই গেল পালটে।

লোকে আড়ালে হাসাহাসি করে, আসমানের মরদ মাটিত পৈরা মাগি হয়া গেছে।

কার পরানে এত জোর, আড়ালের কথা এনে লাঠিয়ালের কানে দেয় ? সারা গ্রামে তার নাম হলো ন্যাংটা পাগল!

কথায় বলে না খাসলত যায় না ম'লে... ন্যাংটা পাগল তক্কে তক্কে স্বপ্নের ফাঁক খুঁজে বের করতে থাকে। ঠিক আছে সে লোভ করবে না, কোনো মানুষ হত্যা করবে না। যদি ডাকাতি করি ? পরেই থরথরিয়ে ওঠে শরীর, ডাকাতের মধ্যে লোভ আছে হত্যাও ঘটতে পারে। কারো সাথে জেদাজেদি রেষারেষি করতে পারবে না— এমন কোনো কথা দরবেশ বলে নি। কিন্তু শুধু জেদ প্রকাশের মধ্যে এমন কী জুইৎ ? এছাড়া মেরে আধমরা করার বারণ স্বপ্নে কেউ করে নি। কিন্তু তাতেও তো রক্তারক্তি হতে পারে।

চোখটা এখনো ক্ষণে ক্ষণে চলে যায় মাস্টারের জমির দিকে। ফের মুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নেয়। দরবেশের কথা অনুযায়ী তার ওই ছোট্ট ক্ষেতেই স্বর্ণ ফসল ফলতে শুরু করেছে। লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ, বীজ বপন সব নিজ হাতেই করে পাগলা। নাহ্, সে আর স্বপ্নের ফাঁক খুঁজবে না, পরে তার দশা লোভী চল্লিশ চোরের মতন না হয়ে যায়।

এইরকম যখন দিন চলছে, তখন একসময় গ্রামে প্রচণ্ড খরার দিন এলো। আন্ধার চোখে পাগলা দেখে তার গোছা ধানগুলো যেন আকুলিবিকুলি করে পাগলার কাছে কিছু পানি চাইছে। ওই একরত্তি জমির জন্য সে ডিপটিউবঅয়েল কিনবে ? ভেতরে যখন এমন ইতস্তত চলছে, তখন তার আলের ওপারের প্রভাবশালীর বিস্তৃত জমিতে ডিপটিউবঅয়েলের পানি ছেড়ে গিয়েছে কুদ্দুস। এদিকে ন্যাংটা পাগলা অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে আপন মনে পাকা আমকে স্তন বানিয়ে চেপে চেপে চুষে খেতে থাকে। এমন ভাব, যেন দুনিয়ার কোনোদিকে তার চোখ নেই। আসলে চোখের পুঁতি নাড়িয়ে তক্কে তক্কে ছিল কখন কুদ্দুস একটা বিড়িতে টান দেয়ার জন্য গাব গাছের নিচে গিয়ে বসে।

পাগলা বলে কথা। কিছুক্ষণ পরই স্বপ্ন সফল হয়। গাব গাছের দিকে হেঁটে যাচ্ছে কুদ্দুস। একেবারে নেউলের মতোন ঝাঁপ দিয়ে সে দুইক্ষেতের মাঝখানের আল কেটে দিয়ে বাতাসের বেগে এসে বসে অশ্বত্থের নিচে এবং তেমনই উদাস চক্ষে আম চুষতে চুষতে গাছের পাতার ঝরঝরানি দেখতে থাকে।

দূরে কুদ্দুস... গামছা দিয়ে গতরে বাতাস লাগাচ্ছে। এইবার আর কোনো ধান্দা নয়, অঢেল জল পেয়ে গাছের ডগাগুলো মাথা নাড়িয়ে কীভাবে পাগলকে কুর্নিশের পর কুর্নিশ করে বসে বসে তার স্বাদ উপভোগ করা।

স্বপ্নে কি এটা নিষেধ ছিল ? না, এটা লোভ না। এটা প্রয়োজন। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন জান বাঁচানো ফরজ। সে লক্ষ্মী সোনা ধান গাছগুলোর পানি তৃষ্ণা মিটিয়ে ওদের জান বাঁচাচ্ছে। নিজের পক্ষে জোরালো যুক্তিটা পাওয়ার পর সেই গাছের নিচেই বড় সুখের নিদ আসতে থাকে চোখে। বসে বিড়ি খাবে ? যেখানে এই কাণ্ড দেখলে প্রভাবশালী পাগলার নয়, স্বয়ং কুদ্দুসের মাথাটাই দু'ফালি করে দেয়ার ডর, সেখানে দুই নম্বরি কাজ করা পাগলাকে কি কুদ্দুস চুমা খাবে ? সবে নিদটা আসবে ঢুলু ঢুলু, দূর পবনের কী সোহাগরে... কী সোহাগ, মিষ্টি মিষ্টি রোদের সাথে মিহি তালে পাগলার খালি গতরে মাখামাখি করছে, পাগলা সবে একটা স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে কী করে নি... গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে কুদ্দুস পাগলার তন্দ্রার মৌজটাকে খানখান করে ভেঙে ফেলে।

তড়াক শব্দে এমনভাবে লাফ দিয়ে দাঁড়ায় পাগলা, যেন সে ঘুমে নয়, অস্ত্র তৈরিতে লিপ্ত ছিল। স্বপ্ন দোষে সে না হয় মূল পেশা ছেড়ে আজ মাজাভাঙা

পাগলা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে সুরুৎ করে মেজাজটাকেও সে ন্যাংটি পরাতে বাধ্য করবে— পাগলা সেই লোক নয়। কুদ্দুসের ছায়া সরিয়ে প্রথমেই তার চোখ যায় কেটে দেয়া আলের দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই কুদ্দুস বিড়ি ফোঁকা বাদ দিয়ে মাটি দিয়ে আলের রাস্তা আটকে দিল ? কাজটা পাগলায় করেছে। কাজটা ন্যায় কি অন্যায় সেই তর্কের আগেই সে কী করে পাগলাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে, আলে বাঁধ দেয়! একটু পানিই তো। লাঠিয়ালগিরি করার সময় প্রভাবশালী কি তাকে কম ঠকিয়েছে ? অবসর পেয়ে গাছের নিচে শুয়ে পইপই হিসেব করেছে পাগলা। তার এক লাঠির ঝনঝনানিতে চরের পর চরের মালিক হয়েছে প্রভাবশালী। বিনিময়ে শেষমেশ এই এক ফালি জমি! তা-ও দরবেশ স্বপ্নে বরকত না দিলে খরায়-বৃষ্টিতে এই জমিও বিরান হয়ে যেত। সেই প্রভাবশালীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে বলে তার উবাস, পিপাসার্ত ধান গাছগুলান প্রভাবশালীর তালুকের এক ফোঁটা পানিও দাবি করতে পারবে না ?

লাঠি ছেড়ে কী জানি কেন পাগলা বল্লম ধরেছে। হাঁটতে ঘুমাতে বল্লম তার সাথি।

ঠ্যাটামিটা লাগাম ছাড়া হয়ে যায়, বিশেষত কুদ্দুসের ব্যবহারে, প্রভাবশালীর লাঠিয়াল থাকাকালীন এই আউল ফাউল কুদ্দুস তার ডরে দশ মাইল দূরে দূরে হাঁটত। কখনো ভুলে সামনে পড়লে তোতলাতে তোতলাতে ওর জিহ্বায় লালা জমে যেত। সে কিনা হুঙ্কার দিয়ে আজ ঘুম ভাঙায় পাগলার ?

কুদ্দুস বলে— ওই পাগলা, তর এইটা কেমনু বিছার ? লাডি ছাইড়া ল্যাংড়া ফকির হইছস, কীসের ডরে ? খাইসলত তো আর বদলাইল না। তাইলে আর কষ্ট কী ? ল্যাংটা কাম ছাইড়া ফের হুজুরের লাডি হাতে ল।

এসব কথার উত্তর মুখে দেয়া পাগলার সাত মেজাজের মধ্যে নেই। মেজাজ চড়া লোক বোদাই হয়, গাছের নিচে শুয়ে প্রভাবশালীর ওপর চ্যাতে ওঠে। সেই বোদাইগিরির ফল সে পেয়েছে। কিন্তু তারপরও মেজাজটাকে নিজের দখলে আনতে পারে না। আজ কুদ্দুসের কথা শুনে কলহের আগুনটা ফলফলিয়ে ওঠে— তর মায়েরে... বলতে বলতে বল্লম খাড়া করে কুদ্দুসের কবজি বরাবর। আন্ধার জিদে শুধু মৃত্যুর হিসেবটাই থাকে, ওকে খুন করা যাবে না— কিন্তু রক্তের হিসাব থাকে না। বল্লমটা হাতের নাগাল ছেড়ে উড়বে উড়বে— কোত্থেকে ফাল দিয়ে কুদ্দুসের সামনে এসে পড়ে সমির। পাগলা যেন চেতন ফিরে পায়। নিজেকে কঠিন যন্ত্রণায় দাবিয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচে উবু হয়ে বসে পড়ে সে।

সমির আর কুদ্দুসের পুরনো দোস্তি ফের নতুন জীবন পায়।

amarboi.com

ধুলো ধোঁয়ায় চোখ কাদা করে উঠোনের চুলোয় ভাত বসিয়েছে অমলা রাণী। পিঠের দিক থেকে এসে পাঁচ বছরের গেদা আচমকা তার বগলের নিচ দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। আচমকা 'মাই' এর মধ্যে মুখ পড়ায় অমলা রাণী ধড়ফড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চুলোর ভেতর খড় ঢুকানো লাঠি লাফ দিয়ে ফেলে রক্তজাম্বুরা চোখ তুলে চেলাকাঠিটা গেদার মাথা বরাবর উঠায়। গেদা কি আর ত্রিসীমানায় থাকে ? মুহূর্তেই সে বাতাস।

ক্রোধ সরে গেলে অমলা রাণীর ভেতর উদাস বাতাস ঢোকে। খানিকক্ষণ সে ঠাহর করতে পারে না দাঁড়িয়ে আছে কী বসে আছে। সামনে চুলো নিভে গেছে। অস্তমিত সূর্যের লহুচ্ছটা বিরান বিরান চরে ছড়িয়ে পড়েছে। এতক্ষণ সে আসলে চুলোয় ছিল না, ভাতে ছিল না। নিজেকে ভুলে, ভুলিয়ে বসে বসে নিদ্রামগ্ন ছিল। তার অসাড় দেহকে গেদা যেন মস্ত এক ঢিল ছুড়ে জাগিয়ে দিয়েছে।

বাচ্চা নিয়ে কঁ কঁ শব্দে দৌড়াচ্ছে স্বাস্থ্যবতী মুরগিটি। গেরামের সন্ধ্যার উথালপাথাল হাওয়া চুলোর আগুন নিবিয়ে দেয়, কিন্তু ততধিক উস্কে তোলে ভেতরের উত্তপ্ত শিখাকে। এইবার অঘ্রাণে ফসল হয়েছে ভালো। সারা বছর কচুঘেটু খেয়ে চিৎকার করে থাকা মানুষেরা নতুন উদ্যমে বাঁচার স্বপ্নে মেতে উঠেছে। অমলা রাণীর শাশুড়ির তো আশ্বিন-কার্তিকে এখন তখন অবস্থা। ঘরের কোনে মশারি টাঙিয়ে দিনের পর দিন বুড়ি বেদিশার মতো পড়ে থেকে মরণদূতের জন্য অপেক্ষা করত। আহারে! সে-কী কঠিন আকুতির অপেক্ষা! ক্ষিদের জ্বালায় বুড়ি শেষদিকে গাছের কাঁচা পাতা পর্যন্ত চিবিয়েছে। এই করে করে হয়তো বেটির জীবনের প্রতি আজন্ম ঘেন্না এসে গিয়েছিল। নিঃসাড় পড়ে থেকে হঠাৎ হয়তো মশারি তুলে গলা খাঁকানি দিত সে— বউ রে কবাটে হুড়কা দিস না, পথ-ঘাট সাফ কইরা রাখ, তেনায় যদি আইস্যা দেহেন পথে জঞ্জাল, তয় তো গোসা কৈরা ফির‍্যা যাইবেন। আমার তহন কী অইব ? অমলা রাণী জন্মের পর থেকে দেখে এসেছে ডানা পা কাটা বৃদ্ধ পর্যন্ত, যার চোখ পর্যন্ত নেই... ধিকধিক পরান প্রদীপ জ্বলে, তার পরেও ইহজীবনের প্রতি তাদের কত মায়া! মরণের চিন্তা কল্পনায়ও আনতে পারে না। তার শাশুড়ি একমাত্র ব্যতিক্রম। যেন মরণদূত নয়, ঘোড়া ছুটিয়ে দূর আসমান থেকে কোনো রাজপুত্তুর আসবে, ক্ষণে ক্ষণে তারই সাথে

চলে যাওয়ার কী অবিনাশী খোয়াব! ইহলোক ছেড়ে স্বর্গ হোক, নরক হোক বুড়ির প্রাণটা আইঢাই করছে পরলোকে যাওয়ার। পেটের খিদা মানুষকে এমন ছ্যাচরা বানায় ? অমলা রাণীর মাথার শিরা দপদপ করে। তবে এটা ঠিক, বুড়ি মরলে অমলা রাণী বাঁচে। সারাটা জীবন ওকে কম জ্বালিয়েছে বুড়ি ?

ক্ষেত থেকে অমলার স্বামী উঠানের মধ্যে পা রেখেছে কী রাখে নি, এর মধ্যেই শুরু হতো অমলার বিরুদ্ধে আসমান পাহাড় অভিযোগের পর অভিযোগ। বুড়ি শাশুড়ির সাংঘাতিক এক বাজে রোগ আছে। ঘুমের মধ্যে বিছানায় পেসাব করে দেয়— এই রোগটাকে বিয়ের পর এক বছরে ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে অমলা রাণীর শ্বশুর স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যত্র বিবাহ করেছে। এরপর স্ত্রীর কথা বাদই দেয়া গেল, মানুষটি এমন নিঠুর পাষাণ, পেটের ছেলেটির খবর পর্যন্ত নেয় নি বহুকাল। এরপর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে পরপর তিন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার পর সে দশ বছর পর ছেলের দাবি নিয়ে এসেছিল অমলার শাশুড়ির কাছে। কিন্তু অমলার শাশুড়ির সাত ভাইয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে নত হয়ে ভিজে কাক হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল তাকে। এই শাশুড়ি অমলার ফুলশয্যা শেষ হয়েছে কী হয় নি, প্রভাতের নিশানা পর্যন্ত নেই, স্বামী তার এক আহ্লাদি ঠ্যাং উঠিয়ে দিয়েছে অমলার উরুর ওপর— খনখনে কণ্ঠে ডাকতে শুরু করেছে অমলা ও অমলা... বউ... অ বউ... ইদিকে আয়... অ বউ... মরদের সোহাগ পাইয়্যা কানে ঠসা দৈরা গেছে ? অ বউ...।

আলগোছে স্বামীর ঠ্যাং গতর থেকে নামিয়ে নিঃশব্দে হুড়কো খুলে সে শাশুড়ির ঘরে গিয়েছিল। অমলা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই যন্ত্রণা ভুলবে ? নতুন বউকে স্বামীর সোহাগী শরীরের তল থেকে উঠিয়ে ফুলশয্যা প্রভাতেই গাদাগাদা মুতের কাঁথা দিয়ে সামনের দিঘিতে পাঠিয়েছিল শাশুড়ি। এই পর্যন্ত তা-ও সওয়া যায়— নতুন বউ, শ্বশুরবাড়িতে প্রথম কাজটা করেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়ার স্বপ্ন কোন নারী না দেখে ? কাঁথা ধুতে গিয়ে দুঃসহ গন্ধে এক হয়ে অমলা আকাশের দিকে দম নেয়ার জন্য মুখ তুলেছিল। বিষয়টিকে সে তবুও মমতার সাথেই গ্রহণ করেছিল। ফুলশয্যার রাতে স্বামী তাকে সব বলেছে, এই একটি দোষের জন্য, যে দোষে তার মায়ের কোনো চেতন অপরাধ নেই, স্বামী-সংসার সব হারিয়েছে তার মা, তাকে যেন একটু বুঝে চলে অমলা।

কড়কড়ে রোদে ধোয়া কাঁথাগুলো মেলে দেয়া বুড়ি শাশুড়ির কাজ। সে অমলার ধুয়ে আনা মোটা দড়ির মতো পাকানো কাঁথাগুলো শুঁকে শুঁকে টসটসে চোখে তাকায় অমলা রাণীর দিকে। এক্কেবারে ফকফকা, কুন গন্ধ নাই... অই পদ্মিনী ওই... এদিকে আয়... বুড়ির খনখনে চিৎকার শুনে পাছা মোড়াতে মোড়াতে দরজায় এসে দাঁড়ায় পদ্মিনী এবং ডাঙর গলায় চিল্লায়— ভগমানের বিয়ানটা না ফুরাইতেই চিল্লানি। এই বাড়ির বাতে কুনোদিন আয় দিব না।

এত দিন বুড়ির কাঁথা ধুয়ে আসছে সে, বুড়ি তার কাছে ঠেকা— এখন অমলা এসেছে, বুড়িকে কে আর সামলায়— হিবিজিবি বহুত পচা গালি দিয়ে সে বলে, তর পাছার মইদ্যে আমি দশবার ঝাড়ু মারি... তুই অকখন অকখন ভাগ... আমার খেতা দোহনের মানুষ আমি পাইয়া গেছি।

সে-ই বুড়ি শাশুড়ি তিনদিনের মাথায় ফিসফিস করে অমলার কানে কানে বলে, আমারে ছাইড়া যে ছেলে একবেলা দম নিবার পারত না, হেয় তর ফস্টিনস্টির মধ্যে পইড়া ক্যামুন বেদিশার লাহান অইয়া যাইতাছে। ভরা যৌবনের ফস্টিনস্টি কয়দিনের বউ? তুই কি জানস যত রাঙা বউই হেয় বিয়া করুক, হের পরানের দড়ি আমার হাতে বান্দা, আমি বেইক্যা বইলে খালি যৌবন দিয়া তর বাপের সাদ্যি নাই অরে আটকায়। আমি আমার ভাগ ছাইড়া তরে দিছি, একটু সমজায়া চল বউ। স্বামীরে কুলের মইদ্যে না রাইখ্যা কামে পাডা...।

এছাড়াও পাড়ার মানুষের আকথা কুকথায় কান দিয়ে এই জীবনে বুড়ি শাশুড়ি কম ভোগায় নি তাকে। দস্তুর মতো বড় সতিনের মতো অমলার সাথে ব্যবহার ছিল বুড়ির। যে অমলার প্রাণের অতল গহনে যে-কোনো মানুষের মৃত্যু চিন্তায় ফুলে ফেঁপে বন্যা উঠত সে প্রায় অনেক বছর যাবত সান্ধ্য প্রার্থনায় শাশুড়ির মৃত্যু চিন্তায় অভিভূত হয়ে থাকত।

সেই বুড়ি শাশুড়ি যখন নিজে ঘটা করে মৃত্যুদূতের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে অমলার চিমসানো কলজে আবার দপ করে জ্বলে উঠেছে, সে জানে অনেক আগেই কেউ কেউ মৃত্যুর পায়ের শব্দ পেয়ে যায় এবং তারপর তার মৃত্যু ঘটে। সেই বুড়ি কিনা অমলার খোয়াব চুরচুর করে দিয়ে অঘ্রাণের ভালো ফসলের গন্ধ পেয়ে খ্যাতা মশারি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ফের নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে তিন লাফে উঠোনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে! তার টসটসে চক্ষের লালচ দেখে কে বলবে, গতরটা বাদ দিয়ে তার বাকি সবটাই পরকালের স্বপ্নে মৌজে ছিল? বুড়ি শাশুড়ি অমলার সাথে সাথে কুলা দিয়ে ধানের চোচা উড়ায়, ধান কোদালি দিয়ে টেনে টেনে উঠোনের মধ্যে সব ধান এক করে... আর ক্ষণে ক্ষণে সেই পুরনো তালে অমলার কাজের কোনো সুঢঙ নেই— এই জাতীয় নানা কথা বলে খনখনিয়ে ওঠে।

আজ জীবনের প্রথম সন্ধ্যায় শাশুড়িকে তার পরম আপনজন মনে হচ্ছে। মানুষ এক সাথে তীব্র ঘৃণার মধ্যেও বাস করতে করতে টের পায় না ওর মধ্যে দিয়েও কখন কোন ফাঁক দিয়ে, অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে অবচেতনে একের প্রতি অন্যে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, চিকন চিকন মায়ামমতার বন্ধনে আটকা পড়ে যায়। অমলা রাণীর বড় ছেলে অনন্ত শহরে গিয়েছিল। যে বাসে অনন্ত বাড়ি ফিরছিল সেই বাস ফেরিতে ওঠার সময় নদীর জলে ডুবে গেছে। শুনে অমলার স্বামী

পড়িমরি ছুটে লঞ্চঘাটে গেছে। সারা বিকাল শাশুড়ি আর সে পরস্পর উথালপাথাল চিক্কোরের পর মৃতপ্রায় অমলা রাণী অবচেতনে চুলোয় ভাত বসায়— অনন্ত এসে খাবে। এই সময় শাশুড়ির খনখনে ভাঙাগলা বহুযুগ পর অমলার গতরে আরাম দিয়ে দিয়ে বলে, আমাগো অনন্ত ডুবব জলের মইদ্যে? কুনোদিন না। ওর মতন হাঁতার কোনো মাছও জানে না। হুনস নাই বউ, বহুত মানুষ বাসের দুয়ার দিয়া বাড়ায়া হাতড়ায়া বাঁচছে? আমি নিশ্চয়ই কৈরা কৈইলাম অর মইদ্যে অনন্ত ফাস্ট! অ বউ... দিঘিত থাইক্যা একটা রুই তুল, পোলার লাইগ্যা মজার সালুন রান্ধ!

উঠোনের ওপর শুকনো পাতা আর খড় মিলমিশ করে পাক খায়।

ঘরে পাশের মিঠা আমের গাছটা থেকে ডানা ঝটপট করে শূন্যে উড়াল দেয় চেনা অচেনা পাখিরা। শাশুড়ির কথায় বুকের মধ্যে খানিকক্ষণ আরাম হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তা দাবাগ্নি করে আমূল ভাসিয়ে নেয় চক্ষু যুগল। বাঁ হাতে নাক পরিষ্কার করতে করতে তার মধ্যে অদ্ভুত এক বোধ জন্মে। এখন ভাত রান্না না করা মানে অনন্ত মরেছে— এই বিষয়টাই মেনে নেয়া। অমলা রাণীর দেহে দৈব শক্তি ভর করে, সে চিৎকার করে কাজের ছেলেকে ডেকে দিঘি থেকে মাছ উঠাতে বলে। নিভে যেতে থাকা খড়ের মধ্যে বুকের সমস্ত বাতাস ফোলা গালে ঢুকিয়ে ফুঁ দিতেই চুলোর আগুন গনগনে, সম্মুখটা আঁধার। সেই আঁধারীর মাঝখান দিয়ে ক্রমশ মূর্ত হয়ে ওঠে প্রথমে লক্ষ্মীপেঁচার ছুটন্ত চিৎকার, এরপর দেহ... সে লাঠি হাতে কুণ্ডুলি পাকানো চোখ নিয়ে অমলা রাণীর কানের কাছে বাতাসের মতো বলে যায়, গেরামে কমলাসুন্দরী আইছেরে... কমলাসুন্দরীর জিন আইছে... এ... এ... এ...।

অমলা রাণীর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

যেন লক্ষ্মীপেঁচা নয়, উঠোন দিয়ে ছায়াবাজির মতো আরেক বাড়ির দিকে ছুটে গেল তার আত্মা! সেই আত্মার বাতাসে এত শীত, অমলা রাণীর রোমকূপে গুঁড়ি গুঁড়ি ওঠে।

সান্ধ্য উলু দিয়ে অমলা রাণীর শাশুড়ি নিজেকে ছ্যাঁচড়ে মাটির বারান্দায় নামায়, এরপর রাম রাম বলে অপসৃয়মাণ লাল রোদ্দুরের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে, কমলাসুন্দরী?

হে হ্!

পেঁচা বেটির কি মাতা খারাপ হৈয়া গেছে?

amarboi.com

কমলাসুন্দরীর গ্রামের সন্ধ্যাটা আজ অস্তগামী সূর্যের লালিমার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। অন্তত সমির আলীর তা-ই বোধ হয়। সবুজ পাতা আর হলুদ সরষের ফাঁস তার পায়ে সোনার বেড়ি পরিয়েছে। সে ক্রমশ অতল থেকে অতলে তলাচ্ছে, ক্রমশ জলের মধ্যে বুরবুরি তুলে ভেসে উঠছে, কিন্তু ইঞ্চি কদমও সামনে হাঁটতে পারছে না।

এখন নিশ্চিত কুদ্দুস কমলা আগমনের সংবাদ জানাবে। না, এই খবর নিশ্চিত করে সমির শুনতে চায় না। যেমন নিশ্চিত করে সে জানতে চায় নি একসময়, কমলা জীবিত, না মৃত ?

আলের ওপরটায় বসে আসমান দেখছে কুদ্দুস। সে-ও কি কমলাসুন্দরীর ভূত দেখে তব্দা মেরে গেছে ? এত চোটপাট করে দৌড়ে এসে কুদ্দুসও দেখি সরষের ঘোরে পড়ে গেছে।

নিজেকে কষে ঝাঁকি দিয়ে ফের বুকের মধ্যে রক্ত তুলে সমির স্ত্রী-সন্তানের লালচের কথা স্মরণ করে কাঁচি খুঁজতে উপুড় হয়।

সমিরকে স্তম্ভিত করে দিয়ে কুদ্দুস অন্য গল্প পাড়ে, ওই বুইড়া খাডাসটার লাইগ্যা মনে লয় গেরামে টিকন যাইব না। বদে হঠাস কৈরা নিজের লগে জানবুজ না কৈরা টুফি পড়লে যা হয়, বেবাক শয়তানিরে হেয় জাগা দেয় টুফির তলে... চোয়ার কুনখানকার! কার কথা বলছে কুদ্দুস... ? খাড়া অবস্থা থেকে নিজেকে ধাতস্ত করতে সমির কুদ্দুসের মুখ থেকে বিড়ি টেনে নিয়ে নিজের ঠোঁটে গুঁজে দেয়... কার কতা কস তুই ?

গেরামে বুইড়া খাডাস কয়ডারে ? দপদপ চোখ নিয়ে কুদ্দুস বলে, ওই লাইঠ্যাল শয়তানের কতা কই, হালার মিসকি হারামি অহন দুনিয়াদারি খাইট্যা বুদ্ধি বাইর করতাছে, কেমনে খোয়াবরে ঠিক রাইখ্যা, নিজে সামনে না থাইক্যা আমারে শ্যাষ কৈরা দেওন যায়।

নাহ্! সমির ভুলই দেখেছে। এই সবই ছিল সান্ধ্যরোদ আর সরষে ফুলের জাদুমায়া খেলা! আদৌ কমলাসুন্দরী আসে নি। এলে তার গা ঘেঁসাঘেঁসি প্রায় প্রতিবেশী কুদ্দুস ওকে দেখত না ? কমলাকে তো সমির তার বাপের বাড়ির দিকেই হাঁটা দিতে দেখেছে!

এই হাঞ্জা অকতে গাছে কাঞ্চি লাগাস... বিড়বিড় কণ্ঠে উচ্চারণ ফের করে কুদ্দুস, তর ক্ষেতে কুন বরকত হৈব না!

পেডের গেদাডা খাইতে চাইল— বলেই শরম পায় সমির, আলের ওপর কেটে রাখা সরষের ডগাগুলো গোছাতে থাকে।

কুদ্দুস অবাক, তর গেদা অইয়া গেছে ?

নাহ্!

কী হৈসে তর ?

কিছু না!

নিরবল ভাবটা ভেতর থেকে চলে যাচ্ছে। কমলা আসে নি, গ্রামটা ঠিক তেমনই আছে, প্রভাতে যেমন ছিল। কী দুঃসহ সান্ধ্য খোয়াব!

কমলার অন্তর্ধানের পরপর সে সাংঘাতিকভাবে এই খোয়াবের খপ্পরে পড়ত।

এক সন্ধ্যায় ঘরে কুপির আলো জ্বেলে সবে সমিরের মা নামাজে বসেছে, দেউরির মধ্যে বেদিশার মতোন বসে ছিল সমির, হঠাৎ দেখে সামনের গাবগাছটার নিচে কার ছায়া। আন্ধারের চিপায় চাপায় আটকে থাকা সেই ছায়ার সামনে গেলে সে মূর্ত হয়— কমলা!

সে-ই কমলা, নিরাভরণ... ছলনাময়ী... সমিরকে ডেকে ডেকে ক্ষেত, আল ভেঙে গুঁড়িয়ে সেই গাঙের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল। রাতে প্রায় অচেতন সমিরকে গাঙ থেকে উদ্ধার করেছিল গ্রামবাসী।

এরপর প্রচুর তাবিজ কবজ বাঁধা হয় সমিরের দেহে। রেজিনাকে বিয়ের কিছুদিন আগ থেকেই এইসব খোয়াবের ঘোর থেকে সমির বেরিয়ে পড়েছিল।

আজ আচানক কোনো কারণ ছাড়া সেই বহুদিন আগের রোগ এই রকম জ্বলন্ত জীবন্ত হয়ে তার ওপর সওয়ার হলো কেন ? সে-তো অন্তত এক সপ্তাহ কমলাকে স্বপ্নে পর্যন্ত দেখে নি!

কী করতাম ক'তো সমির! বুইড়া লাইঠ্যাল কয়, আমি হাপের লেজে পা-ও দিছি, শুদ না নিয়া তার শান্তি নাই। আইচ্ছা তুই-ই ক' আমি কি আমার জমির লাইগ্যা তার লগে দরবার করছি ? যার জমিন তার কাছে গিয়া ক! আমি যার নুন খাই, তার জমিন দেহা আমার কাম না ? তার জমি কাইটা হেয় বেআইনি পানি নিব আর আমি টিপ মাইরা থাহুম ?

বাদ দে তো! ছড়ছড়িয়ে শান্তি নামে সমিরের দেহে, কমলাসুন্দরীর মরণ ঘোর থেকে বুড়ো লাঠিয়ালের হুজ্জোতে পড়ে পরানটা একেবারে আসমানের মতোন প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে... কুদ্দুসের কাঁধে হাত রাখে সে, এই গুসা বুইড়ার

বেশিদিন থাকব না। এর পিছে হুজুর আছেন, আমরা আছি, তরে এই চিকনা কারণে বুইড়া মাইরা ফালাইব, অত সুজা ? লেঙ্গা ভাঙ্গা হাপের ফোঁস ফোঁস বেশি... কয়ডা দিন যাইবার দে, ঠিক হয়া যাইব।

নুসরাত বানুর আয়েশি পাঙ্গাস মাছ চকচক দেহ নরম বিছানায় ডুবে আছে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের পশুপাখিগুলো পর্যন্ত যখন সৃষ্টিকর্তার উপাসনায় কিচিরমিচির... তখন খিড়কি দিয়ে আছড়ে পড়া লাল সূর্যের রশ্মি কোথায় কোথায় যে টেনে নিয়ে যায় নুসরাত বানুকে!

হায়েশ হয়েছে। এখন নামাজ পড়া হারাম। এই দিনগুলোয় সন্ধ্যা বড় বিষণ্ন করে দেয় নুসরাত বানুকে। মুহূর্তগুলো লম্বা লম্বা... বাড়িতে এত চাকর বাকর, কিচ্ছু কাজ করার সুযোগ নেই।

দু'হাতে মোটা বালা, কয়েক ভরি ওজনের ভারি নেকলেস তার থলথলে দেহটাকে কারুকার্যময় করে তুলেছে। ইদানীং প্রায় সন্ধ্যাগুলোতেই সে অন্য একরকমের খেলায় লিপ্ত হয়ে খুব আমোদ বোধ করে। কাজের ছেলেকে দিয়ে গ্রামের যখন যাকে মনে হয়, তেমন হতশ্রী দরিদ্র মহিলাদের দুই-তিনজনকে খবর পাঠিয়ে আনায়। এরপর ওরা যখন আলমিরায় ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসে অবাক হয়ে নুসরাত বানুর দিকে তাকাতে থাকে, তখন নুসরাত ওদেরকে মুড়িগুড় ফলমূল খেতে দেয়। ওদের লোভ চকচক চোখ যখন খাদ্যের দিকে, তখনই নুসরাত সাজতে বসে। ওদের খাওয়া সম্পন্ন হয়, নুসরাতের সাজ সম্পন্ন হয়। বহুবর্ণ গয়নার রূপচ্ছটায় রঙিন হয়ে ওঠে সন্ধ্যা! ছিন্নমূল মহিলারা অবাক বিস্ময়ে সেই রূপ দেখতে শুরু করলেই নুসরাতের শুরু হয় গা মোচড়ানোর পালা।

সে চকিত চাহন, চোখ কটাক্ষ করে যেন মহিলাদের বিস্ময় চোখ নয়, আয়নায় নিজেকে দেখছে, এই অনুভবের মধ্যে ডুবে যায়।

আজও তা-ই!

উদাম সন্ধ্যাকে কষে বেঁধে সে কাদা মাটি লেগে জীর্ণ হয়ে আঙ্গুরীকে প্রশ্ন করে, ক'তো আমার এই বালা দুইটার দাম কত ?

আঙ্গুরী নামের মহিলা পান আস্তর পড়া মুখে হেসে পাশে বসে আলেয়ার দিকে তাকায়, কত হৈব ?

আলেয়াও দিশা খুঁজে পায় না। শেষে দুইজন পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্তে আসে, তা ম্যালা হৈব, দশ কুড়ির কম না।

ভালাই কইছস... এইবার এটার সত্যি দাম বলে মহিলা দুটোকে টাশকা লাগানোর আমোদ— নুসরাত বানু সশব্দে উচ্চারণ করে, দুইটা বালার দাম হৈল গিয়া চল্লিশ হাজার ট্যাকা... কী-রে আঙ্গুরী, অমন তব্দা মাইরা গেলি যে ? চল্লিশ হাজার কারে কয় বুজস ?

আলেয়া আঙুলের কড়ায় সেই দামটিকে খুঁজতে চাইলে খুব জোরে এক চোট হাসে নুসরাত, বেক্কল!

নুসরাত বানুর অস্থির চোখ জানালায়... কখন স্বামী আসেন! তার এই সজ্জা, স্বামীর খুব পছন্দ। কী কাজে গঞ্জে গেছেন প্রভাবশালী, সন্ধ্যায়ই ফেরার কথা।

এইবার নিজেকে নিয়ে নিজের আত্মধ্বংসী খেলা... এই বিষে ধুলে রাবণের চিতা জ্বলে... তবুও গড়িয়ে গড়িয়ে সেই বিষের দিকেই জিহ্বা ঠেলে দেয়া, এই অন্তর্দাহ নিয়ে একলা বাঁচার চেয়ে এর তলাকার সত্য খোঁজা... না, নুসরাত বানু কারো চাইতে ছোট নয়, প্রভাবশালীর প্রথমা মৃত স্ত্রী, কমলাসুন্দরী... কারোর চাইতে না। ওরা আজ গত, নুসরাত বর্তমান... তবুও তবুও... তার মুখে মিশমিশে কালো ছায়া পড়ে— তরা কুনোদিন আমার স্বামীর প্রথমা বিবির অত গয়না দেখছস ?

না! না! মুড়িগুড়ের ঢেকুর তুলে দুই মহিলাই একত্রে বলে, তিনি হাজতেন না, খালি নামাজ রোজা লৈয়া থাকতেন।

আমিও তো নামাজ রোজা করি, নুসরাত বানু যেন নিজের সাথেই তক্কো করে, তয় হাজতে অসুবিদা কী ?

যার যেরকম বুজ... আলেয়া অস্ফুটে বলে।

নুসরাত বানু বলে— এই একই মানুষ তো, আমারে না সাজলে কত বকে, তিনি সাজতেন না, ক্যান ?

এইবার আঙ্গুরীর নুসরাতকে তেল দেয়ার পালা— তিনি জানি কেমুন বুড়ি বুড়ি আছিলেন— আপনে কত সোন্দর, চোহে না খাইলে সাজায়া কী লাভ, তা-ই তিনি সেই বিবির সাজন চাইতেন না... কীরে আলেয়া, আমি বেঠিক কৈছি ?

না। ঠিকই। বলে আলেয়া, তেনার চরিত্র বালা, হের লাইগ্যাই, তার মরণের আগে আর শাদি করেন নাই... উনি তেনারে বিবি খাদিজা কৈয়া ডাকতেন... বড় পয়মন্ত ছিলেন, উনি বিশ্বাস করতেন ইস্ত্রীর বরকতেই তার জমিন সম্মান বাড়ছে, তারে বিগড়াইলে সব বাতাসে মিশ্যা যাইব...

amarboi.com

এই তো কালো অধ্যায়গুলো আসছে... আঙ্গুরী তাকে আসমানে উঠাচ্ছে তো আলেয়ার সত্য তাকে গহীন পানিতে ডুবাচ্ছে... নুসরাত বানু সান্ধ্য রোদ লালিমায় চোখ রেখে নিজেকে আরেক ধাপ নামায়—

তেনার সন্তান আছিল না...

হে-তো আপনেরও নাই...

আলেয়ার এই স্পর্ধিত উচ্চারণে চেতে অগ্নি হয়ে যাওয়ার কথা যে নুসরাত বানুর সে প্রাণজ্জ্বলন ঠোঁটে চেপে কী যেন বলতে চায়, কিন্তু ততক্ষণে খেঁকিয়ে উঠেছে আঙ্গুরী, ছুড মুকে বড় কতা! ওই আলেয়া, গেন্দাবাচ্চা কি মাইনসে বানাইবার পারে ? ওতো আল্লায় বানায়...।

জানালায় চোখ— এই বুঝি স্বামীর ছায়া দেখা গেল, নাহ্ আরেকটু পরে আসুক সে, নইলে যে নুসরাতের বিষআগুন খেলাটাই পণ্ড হয়ে যায়!

কার দুষ ? নুসরাত বানু প্রশ্ন করে, আমার বিয়া হৈছে দুই বছর, বাচ্চা অয় নাই, তার আগে তেনার প্রথমা বিবির সাথে বারো বছরের সংসার। টিকল ক্যামনে ? বাচ্চা কাচ্চা ছাড়া ? কী এমন জাদু জানতেন প্রথমা বিবি... ?

পুরুষ মানুষকে আঁটকুড়ে বানিয়ে ফেলে... আঙ্গুরী-আলেয়ার সেই সাহস নাই। তারা দুইজনই হা হয়ে নুসরাতের প্রশ্নের গূঢ় অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। সেই জাঁকালো স্বরের আড়ালে কী খেলা ? দিশা পায় না তারা।

এদিকে সন্ধ্যা আটকে আছে, সূর্যের মৃত্যু মুহূর্তের লহুতে আজান পড়বে পড়বে, ঘরে দুনিয়ার কাজ, দুই নারী ভেবে আকুল হয়, কিন্তু নুসরাত বানুর কাণ্ডে কিছু বলে সাহস পায় না। বরং আলেয়া বলে, বেশ সাহস করেই— কইলাম তো প্রথমা বিবি বাঁজা হইলেও পয়মন্ত। তারে নারাজ কৈরা কিচ্ছুতে বরকত পাইতেন না আপনের স্বামী। কার দুষ ? আল্লায় জানে, তয় আপনের স্বামীও মনে অয় জানেন, আঙ্গুরী বলে, তয় আমি জানি— আপনের দুষ না।

নুসরাত থাবা পেতে পেতে এগোয়— এইবারও যদি বাচ্চা না অয় ? তিনি ফের শাদি করবেন ? আমি তো আর পয়মন্ত না। কী দিয়া বান্ধুম ?

এইসব কী কথা বলছে নুসরাত ? নিজের অবস্থান ভুলে গেছে ? ভয় হতে থাকে দুই নারীর, নুসরাতের যন্ত্রণাকর রগড়ের মধ্যে কী না কী বলে ফেলে তারা, শেষে বেয়াদবি হয়ে যায়, আর প্রভাবশালী যদি জানেন ? নুসরাতকে কি পাগলা কুত্তায় কামড়াচ্ছে ?

আঙ্গুরী বলে— আপনে তো চান্দের লাহান। খালি পয়মন্ত হৈলে অয় ? পুরুষেরা হারাদিন বাইরে খাটনির পরে ঘরে আইয়া যদি চান্দমুখ দেহে, আর কী চায় ? সম্পত্তি তো আপনে গো অনেক আছে, সম্পত্তি মাইষে বানায়, তয় রূপ বানায় আল্লায়, আপনে হৈলেন গিয়া হেই বাগ্যবতী...।

আঙ্গুরীর কথা শেষ হয় না, এইবার নুসরাত বানু নিজের বুকের মধ্যে যেন শেষ ছুরিটা বিদ্ধ করে— আর কমলাসুন্দরী ?

চমকে ওঠে দুই নারী, আলেয়ার মুখ থেকে ফশ করে বেরিয়ে পড়ে— হেই রূপ কি মাইনষের রূপ ? তার লগে কীসের তুলনা ? ওই রূপ সর্বনাশা...।

চুবচুবে লহুতে নুসরাতের সর্বঅঙ্গ চোবানো... আহা তুফান কৈ ? ভাইস্যা যাই... ক্রোধে, যন্ত্রণায় অসহায়ত্বে নুসরাত তার আংটি আঙুল দাঁতের চাপে পিষে ফেলতে চায়... আয়না... আয়না... সুন্দরী আয়না, কে বেশি সুন্দরী... বল না বল না...

এরই মধ্যে দুয়ারে আছাড় খেয়ে পড়ে লক্ষ্মীপেঁচা... এরপর তিনজন মানুষকে আসমান থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে, কমলাসুন্দরী আইছে গো গেরামে... কমলাসুন্দরীর জিন আইছে...।

সমির বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে চায়, কুদ্দুস কাশির দমকে ধুঁকছে। সমিরের ইচ্ছে হয়, কমলার প্রসঙ্গটা তোলে, পরমুহূর্তেই কেঁচোর মতোন কুঁকড়ে যায়, যদি সত্যিই কমলা গ্রামে না ফিরে এসে থাকে, তবে নিশ্চিত কুদ্দুস ধরে নেবে এখনো সে কমলার খোয়াব নিয়েই বছর বছর পড়ে থেকে রেজিনাকে ফাঁকি দিচ্ছে! কী করবে সমির ? বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে সন্ধ্যার টুকটুকে রোদ্দুর চারপাশ ঘিরে ধরে, আর দুই পা পেঁচিয়ে ধরে আঁধার গোখরোরা। তার মনেই হয়, কমলা এসেছে কি আসে নি পা বাড়ালেই এর একটা সমাধানের জায়গায় পৌঁছে যাওয়া। কোথায় যেন ক্ষীণ পরান ধিকধিক করে, কমলা বেঁচে থাকুক... আসুক... সে মরদ ব্যাটা, কমলাকে সে বিয়ে করে রেজিনাকে তালাক দেবে। কিন্তু রেজিনার পেটের আবু ?

হাত পায়ের গিঁটে গিঁটে বেদম যন্ত্রণা... না আসুক কমলা না আসুক... কিন্তু পা বাড়ালেই যদি দেখতে হয়, সত্যিই সে এসেছে! আদ্দেক এসেছে আর আদ্দেক আসে নি এই ঘোরে পাক খেয়ে সে ফের কুদ্দুসের মুখোমুখি হয়, আইজ কি সূয্যি ডুবব না ? কী হৈছে আইজ হাঞ্জার ?

বুইড়াডারে ক্যামনে শিক্ষা দেই ? কুদ্দুস আছে নিজের তালে।

তুই ওই মাজা ভাঙ্গাডারে ডরাইতাছস ? সমিরও যেন অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে ছেড়ে বাঁচতে চায়, হেয় অইছে গিয়া খোয়াব বন্দি মানুষ। খোয়াব অর মাজা ভাইঙ্গা দিছে, হেয় বেড়ি ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা চিপায় চাপায় কত আর রাস্তা পাইব ? তরে ত কইছিই, বিষ দাঁত ভাইঙ্গা গেছে, এর লাইগ্যাই ফোঁস ফোঁস, লাইঠ্যাল অইলে তর লগে হে কতা কইত ? কতার আগে অর লাডি চলত!

কী যেন একটা অবডব অবস্থার মধ্যে পড়েছে কুদ্দুস, সরষের ঘোরে কি সে-ও পড়ল ? বাড়ি যাওয়ার কোনো লক্ষণই নাই। সে যেন এই আইলের ওপর রাত কাটাতে এসেছে... সমির বলে— তর পিছনে হুজুর আছে...।

খেঁকিয়ে ওঠে কুদ্দুস— অগো তুই চিনস না, আমারে কয়, তুই সামলা, পুরানা লাইঠ্যাল, আমি অর লগে কাইজ্যা করবার চাই না। তর মামলা তুই বুজ। আইচ্ছা ক সমির, এইডা কুনো হকের কতা কৈল হেয় ? মামলা আমার ? জমিডা কি আমার বাপের ? শুয়োরের বাচ্চা!

গালিটা কুদ্দুস কাকে দিল সমির বোঝে না। বোঝার দরকারও নেই তার যেহেতু ফের তাকে সান্ধ্য ভূত ক্রমে ক্রমে চেপে ধরতে শুরু করেছে। সে ঝাপসা চোখ ঠায় পাঠিয়ে দেয় দূরবর্তী রামদাসের মাটির ভিটের দিকে। নাহ্! ওখানে কোনো তরঙ্গ নেই। উত্তরের বাতাস ঝাপটা দেয়। সিরসিরিয়ে উঠতে থাকে রোমগুলি। কোঁচড়ে গুঁজে রাখা রুপার বালা দুটি পরখ করে কমলাসুন্দরীর হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটিকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করার চেষ্টা করে।

হিঃ হিঃ হিঃ কমলাসুন্দরীর সেই জাদু হাসি ছড়িয়ে পড়ে ধান মাঠ বৃক্ষের শরীরে শরীরে। উবাস প্রকৃতি গিলে গিলে খায় সেই তরঙ্গ। হুনো, রাণী কমলার কিসসা— বাঁশঝাড়ে ওর বুকের নিচে পড়ে থাকা কমলার মনে কি ডরভয় নাই ? বাড়ি যাওয়ার ছটফটানি নাই ? যতটা সময় যেমন পাওয়া যায়, সমির মনে করে সুদে আসলে মাখামাখি, সোহাগ আদর... গতরে গতর... এই সময়ে কারো কিচ্ছু শোনার অবসর হয় ? কিন্তু এ যে কমলাসুন্দরী, কিসসা বাদ দিয়ে সে যদি কমলার শরীর কেন কানি আঙুলও ধরতে যায়, ছিটকে ছিটকে যাবে, ওর শরীর ঠাণ্ডা হতে থাকবে, আর ওর বাক্য! উহ্হুরো... যেন ধানি মরিচ, পুরুষগুলান এমুন ক্যান ? খালি গতর... গতর... গতরের মাংস ছাড়া ওগোর সোহাগ অয় না। ঘিন্না দৈরা গেছে... বলে সে বিড়বিড় করে অভিশম্পাত করত প্রভাবশালীকে। তখন কমলার ওপর পড়ে থাকা সমিরের আধা নেংটো দেহটা দুঃসহ শরমে এক্কেবারে ঠাণ্ডা লোহার মতো হয়ে উঠত... সে নিজেকে সরাতে চাইলে কমলা ওর ঘাড় খামচে ধরে, উঠবা না— এইখানে হুইত্যাই হুনবা। রাণী কমলা হৈল গিয়া রাজা জানকীনাথের অতি সোহাগের পেয়ারের স্ত্রী। পরমা সুন্দরী। রাজ্য জোড়া সেই রূপের খ্যাতি। একদিন রাণী রাজার কাছে তার সোহাগের চিহ্ন দেখতে চাইল।

কমলা সাগর নামে এক দিঘি বানায়া দিবার কৈল রাজারে। রাণীর স্বপন— যতদিন দিঘি থাকব, ততদিন এই রাজ্যের বেবাক মানুষ রাণীরে মনে রাখব। আধভেজা দেহে সমির উত্তপ্ত যৌবনা দেহের ওপর ল্যাপটে আছে। রাত বকদের ডানা ঝটপট আর খড়বালি শুকনো পাতা বেয়ে গায়ে উঠতে থাকা পিঁপড়ের পিরপির করে শরীরে উঠা। বুকে ধরাস ধরাস ওর, এই বুঝি হারিকেন নিয়ে খুঁজতে এলো কেউ... এই বুঝি রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। কিন্তু সুন্দরীদের ছলাকলার লেজ স্বয়ং বিধাতাও ধরতে পারে কী-না সন্দেহ। ভেতরে অশান্তি নিয়ে সমির শোনে কমলাসুন্দরীর কাহিনী—

স্ত্রীর আবদার পূরণে শত শত মজুর লাইগ্যা গেল পুস্কুনি খোঁড়ার কামে। কিন্তু এ-কী ডহর দিঘির মইদ্যে কিছুতেই জল জমে না! মজুররা আরো খোঁড়ে। নাহ্! তল থাইক্যা একবিন্দু জল উডে না।

গণ্যমান্যেরা বলে— এই দিঘিত জল না উঠলে আমাগো চৌদ্দপুরুষের জায়গা হইবে নরকে। রাজা হায় হায় করে। রাণীর চক্ষেও জল। শেষে রাজা স্বপনে দেহে কমলা-রাণী জলে নামছে, এবং সেই জল কমলার মাতার অনেক উপরে গিয়া পাতালে ঠেইল্যা দিতাছে কমলারে, পুস্কুনি কুলকুল কৈরা ভৈরা যাইতাছে।

রাজার মাতায় ঠাটা পড়ে। হইলে হবে কী রাজার আহাজারি চিক্কোর পিছনে ফেইল্যা চৌদ্দপুরুষ বাঁচাইবার লাগি রাণী কমলা পুস্কুনিতে নামে—

সমির ফিসফিস করে, কমলা... আজান পড়তাছে... উডো... উডো...।

গহীন রাইতে রাণী দাসীগোরে নিয়া নদীতে যায়। দাসীদের কারো কাঙ্গে সোনার কলসি, কারো কাঙ্গে তেলের বাটি, কারো হাতে নানা রকম ফুলের সাজি। রাণী নামলেন সেই সোনাই নদীর মইধ্যে...।

কমলার শরীর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সমির তাজ্জব হয়ে দেখে, কমলার মধ্যে যেন কিছু আছর করেছে। সমির ওর বিশৃঙ্খল শাড়ি ঠিক করে দিতে থাকে... আর কমলা বলে যেতে থাকে কাহিনী।— রাণী কয়, হে নদী— তুমি সাক্ষী থাইক্যো, গাছপালা সাক্ষী থাইক্যো, সাক্ষী থাইক্যো আসমানের তারা। আমি জীবন বিসর্জন দিমু। আমার চৌদ্দপুরুষেরা যেন নরকে যাওয়া থাইক্যা মুক্তি পান।...

কমলা! কমলা! প্রাণান্তকর ঝাঁকি দিয়ে কমলাকে দাঁড় করিয়ে সমির অবাক হয়ে দেখে কমলাসুন্দরীর অভিব্যক্তির কোথাও সমিরের চেনা কমলা নেই, যে আছে সে এক অচেনা নারী, সে সমিরকে চেনে না।

কমলা ফিসফিস করে বলে... আমিও একদিন অজানা জলের তলায় হারায় যাইমু।

amarboi.com

সমির ভয়ে কেঁপে ওঠে... এ প্রেমের পরীক্ষার জন্য কোনো রকম আকুলিবিকুলি কথার বিস্তার নয়... কমলা যেন সেই রাতে ভঙ্গিতে, সজ্জায়, চাহনিতে রাণী কমলা হয়ে উঠেছিল।

সমির ভুল দেখে নি।

সেদিন সন্ধ্যায়ই কমলা এই গ্রাম ছেড়ে দূর দুনিয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল।

প্রভাবশালীর দহলিজের এক কোনায় যে নেড়ি কুকুরটা শুয়ে থাকে, আর হাবার মতোন আড়মোড়া ভাঙে, সে ছাড়া ত্রিচত্বরে রামদাসের ভাষা বোঝার মতোন লোক নেই। তার সাথেই রামদাসের রাগ, অভিমান, যুদ্ধ, প্রতিবাদ। বাকি সময় সে প্রভাবশালীর ছায়ামূর্তি। প্রভাবশালী হাঁটেন। রামদাসের ঠ্যাং-এর তলায় কাছিমের মাংস। শুধু তার সঞ্চালন টের পাওয়া যায়। ক্লিশিত দেহ, অধীন মস্তক মাটিতে নামিয়ে রামদাসের চিরদিনের চলাফেরা। অতঃপর আসমানের রাঙামুখ দেখে প্রভাবশালী যদি প্রশ্ন করেন— ক'তো দাস, আসমানের রাঙা ঐসব কী!

রামদাসের বিনীত উত্তর, আপনেই বেবাক জানেন হুজুর।

ওইসব হৈল গিয়া হাসান-হুসেনের রক্ত। হুঁকোর লম্বা নলে তৃপ্তির টান দিয়েও আচমকা প্রভাবশালীর মুখ তমস। স্মৃতির ছপ্পর ফুঁড়ে আরো দূর না দেখা অতীতে চিন্তা হাঁটতে যায়; তুই কারবালার ঘটনা জানস না... হাঃ হাঃ হাঃ আমি কী বেক্কল দেখ! তুই ক্যামনে জানবি ? তুই তো মালাউন, হেইডা খালি খালি ভুইল্যা যাই।

এইসবই কমলাসুন্দরীর অন্তর্ধানের আগের কথা। রামদাস ছিল প্রভাবশালীর রীতিমতো ক্রীতদাস। এরপর প্রভাবশালীর শুরু হয় কারবালা বর্ণনা। নিস্তেজ ভঙ্গিতে পায়ের তলায় বসে থাকে রামদাস। চোখের সামনে ছবি ভাসছে যেন... এইরকম যিগির করতে করতে বলে যান প্রভাবশালী— কচি মাইয়া ফাতিমা ধুলায় লুটায়, মোহাম্মদের পরম প্রিয় নাতি হাসান-হুসানের জিব্বায় এক ফোঁটা পানি কে দেয় ? পিপাসায় যে বুকের ছাতি ফাইট্যা যায়। হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষের হায় আল্লা কী করুণ পিপাসার আহাজারি! কইরে কঠিন পরান পিশাচ এজিদ! তর শইল্যে কি মাইনষের লহু নাই ? তর বক্ষে কি মাইনষের কইলজা নাই ?

সেই কাহিনী শুনে রামদাসও আহা আহা করে, গল্প বলতে বলতে প্রভাবশালী কাঁদেন।

রামদাসও কাঁদে।

প্রভাবশালীর পিঠের ঘামাচি খুঁটতে খুঁটতে, ফাটা চামড়ায় তিলের তেল ঘষতে ঘষতে রামদাস যখন দেখে, কারবালার প্রান্তর ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে গেছেন প্রভাবশালী, বালিশের মধ্যে তাঁর মাথা ঢুলে পড়েছে, নিঃশ্বাস উঠছে লম্বা লম্বা... আয়েশি মুখ নেড়ি কুকুরের মতো দু'ফাঁক হয়ে এসেছে, ওই সময়টুকুই কেবল রামদাসের ছুটি।

সে বাড়ি যায় না। একেবারে সব কাজ শেষ করে বাড়ি যেতেই তার জুৎ। কমলাসুন্দরী বেড়ে উঠছে। সে এসে সারাদিনের অদেখা বাপের কোলে খলবল করতে করতে বসে। রাধা রাণী নিয়ে আসে হাতপাখা। তাতেই শান্তি রামদাসের।

প্রভাবশালী দিনে ঘুমালে রামদাস দিগন্তজোড়া মাঠ ধরে দৌড়য়। তার মাঝখানের অশ্বত্থ গাছে নানান পাখপাখালির ভিড়। উত্তরাশার পথ ধরে বাউরি বাতাস আসে। উন্মত্ততায় নেচে ওঠে শকুন। অস্থির ঠোঁট মরা বাকলে ঘষে ফের উড়াল। পুরো গ্রামটাকে চরণের তলায় নিয়ে স্বাধীন ডানা পা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষ। কী গভীর ছায়া! রামদাস চিতাশালা থেকে বেরিয়ে সেই ধুলো পাতার ভিড় থেকেই ওমের মতোন মমতা শুষে নেয়, কখনো দু'পা ওপর দিকে তুলে মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগোয়। এ এক মজার খেলা। জনহীন শস্যমগ্ন উজানি জমি দূর দিগন্তের ঢালু পথে উলটো হয়ে নেমে এসেছে। সমান্তরাল খেজুর গাছ, গাঙের ওপরে উড়ন্ত ডানাগুলি, ধুলোবাউরি বাতাস... সব উলটা। কেবল কয়েকক্ষণের জন্য রামদাস আসমানের বুকে পা রাখে। তার বড় ইচ্ছে হয় প্রভাবশালীর মতোন খড়মে শব্দ তুলে সেই পথ ধরে হাঁটে।

এক সময় সন্ধ্যার অশ্বত্থগাছ বাতাসের ঝাপটায় ফিট পড়া বালিকার মতো গোঙানি দিয়ে ওঠে। কালো-শাদা বোরখার ভেতর ঢুকে যেতে থাকে সান্ধ্য চরাচর। গঞ্জের হাট থেকে চাবুক খাওয়া ক্রীতদাসদের মতো ঝুঁকে ঝুঁকে শ্লথ মানুষ দূর দূর গ্রামের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। রামদাস প্রভাবশালীর বাড়ি ফেরে।

রামদাস চিলিমচি আইনা দে।

চিলিমচি হাজির।

হুক্কায় আগুন দে।

হাজির।

বেলের শরবত বানায়া দে।

হাজির!

মাতাডা বানায়া বানায়া দে।

রামদাসের আঙুল চলতে থাকে।

আহা! বেদনাডা কোমরে চইল্যা গেল।

আঙুল নেমে আসে।

এক গেলাস পানি।

হাজির।

বিরামহীন প্রভাবশালীর কথোপকথন— জমিগুলান পুইড়া যাইতাছে, কী রাক্ষুসী খরায় ধরল রে, বৃষ্টি কি আর আইব না ? পাকিস্তান আমলই ভালা আছিল রে রামদাস। গেরামবাসী বুঝল না। আমারে দিনরাইত পিছনে গালি দেয়। মাইনষেরে ভালা কী জিনিস হেইডা বুঝানি বড় কঠিন! তুই তো মালাউন, তরেই বা ক্যামনে বুঝাই... তা-ও কই। এইডা কি আমার দেশ ? তুই-ই ক রামদাস গোরে গেলে কুন ভাষায় ফেরেশতাগোর লগে কতা কৈতে অইব ? এই দুইন্যায় কুন ভাষায় আল্লা তার বাণী পাডাইছে ? নয়া পানির ট্যাংরার লাহান ফাল পাইড়া পাইড়া পুলাপান বাংলা বাংলা করে। চেডের বাংলা! তর কমিন বড় বাইডারে 'ভালা' কী জিনিস বুজাইবার পারি নাই। বাঁইচ্যা থাকতে কত কষ্ট দিছে আমারে... প্রভাবশালীর ঠোঁট কোন অজানা বোধে যে কাঁপে— সান্ধ্য প্রহরের নীরবতা পেরিয়ে বালি হাঁস উড়ে যায়। প্রভাবশালীর আত্মায় হঠাৎ ঢেঁকির শব্দ... তার সুদূরের ক্ষেতে, শস্যে প্রসারিত চক্ষু অলীক তীব্রতায় টানটান।

হুক্কাটা বুজলি পুসপাস— প্রভাবশালী হাসে, পুরানা ঐতিহ্য... আইজকাল বেনসনের ফুটানি আইছে... কিন্তু আমার হুক্কার পুসপাসেই শান্তি... রাজা রাজা ভাব আহে...

রামদাস চুপ।

বুজলি রাম, জনমের পর থাইক্যা আমার রক্তে নেশা একটাই... জমি... তুই তো জানস ভালো কইরাই। দুইন্যার যে মাতাত থাকি— জমি। আমি মরলে আমার চামড়া কাটলে দেখবি, হাড্ডি নাই, গোশত নাই, খালি ধান। বছর বছর তর বুইড়া ভাইডা আমারে কী শাস্তিডাই না দিল! গোর আজাবও বুধয় অত কষ্টের না।

সূর্য ডুবে যায়। তেল চিটচিট গেঞ্জি রামদাসের চামড়া ঠেসে ধরে। ঠ্যাংয়ের গিঁটে টাটানি ধরে গেছে। আঙুল চলছে প্রভাবশালীর সমস্ত মস্তক জুড়ে। অবিরাম বকে যাচ্ছেন তিনি... আমি কাছারি ঘরে বসুম... যদ্দূর দুই নয়ন যায়... বেবাক জমি আমার... এইডা হৈল গিয়া আমার জন্মখোয়াব। কিন্তু খোয়াব কি পূর্ণ হয় ? কইলজার মইদ্যে তুফান আগুন! রাত ভর পালঙ্কে শুইয়া ছটফট করি। হেশে আমার খোয়াব পূরণ করল কে ? সুজলা জমির লালচে প্রভাবশালীর মুখ ঢুলুঢুলু হয়ে উঠে— বুইড়া লাইঠ্যাল! আরে ও আছিল মরদ। হেই মরদের লাডির ধাক্কায় কই ছিটক্যা পড়ল দুরাহাপের তর্জন গর্জন!

রামদাস ভাবলেশহীন, নিশ্চুপ!

তুই তো ঠিকই বুঝছস... তর ভাই ইতরডায় করছিল কী ?

সমিরের কেমন ডর ডর লাগতে থাকে। ওকে জিনে ধরল না তো ? সরিষার ক্ষেতে জিন থাকে, এ-তো সে ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছে। এরপর মাগরিবের সময় গাছের ডাল কাটলে পাতা ছিঁড়লে পাপ, গাছেরা অভিশাপ দেয়... এত কিছু বুঝে শুনেও সে টনটনে পায়ে প্রেতপুরীতে দাঁড়িয়ে আছে ? কিন্তু এখান থেকে সরা মানে, যে-কোনো একটা সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া... কমলাসুন্দরী বেঁচে আছে, অথবা মরে গেছে। ক্রমে ক্রমে তার মনে হয় কমলার জীবন, মৃত্যু কিছুতেই এখন আর সমিরের মুক্তি নাই। কমলা বেঁচে আছে মানে... আবার সারা জীবন পাকা ডালিমটাকে নাকের সামনে ঝুলতে দেখা। সন্তান সংসারী সমিরকে কি কমলা বাঁ ঠ্যাংয়ের নখের আঙুল দিয়েও পুছবে ?

আর যদি সমির গিয়ে দেখে সব ভুল... কমলার এই যে সাঁই সাঁই জীবন্ত এসে দাঁড়ানো... এ ভ্রম... এ সমিরের সান্ধ্যপ্রহরের মায়া... তাহলে সমিরের পুনরায় সহজ স্বাভাবিক জীবন খতম। তাহলে আজ থেকে শুরু হলো, কমলার আত্মার সমিরের সাথে নয়া খেলার শুরু।

সূর্যটা আটকে গেছে। কেবল প্রবাহিত হচ্ছে মেঘ।

আটকে গেছে সরষে বনের বাতাসও। সমিরের মধ্যে ভর করে মৃত্যু ভয়ের অনুভূতি। হাঁটতে গেলেই আলের মধ্যে ঠুয়া খাচ্ছে। নিজের বেকুব অবস্থার প্রতি চরম গোসসায় থিতু হতে গিয়ে টের পায় তার চাইতে অধিক দুর্বলতায় প্রাণ পাখি ধুকধুক করছে। না! সরষে বনের সামনে কিছুক্ষণ আগে তার সামনে শব্দহীন যে দাঁড়িয়েছিল— সে কমলা নয়। কমলা নয়... কমলা নয়... সমিরের প্রাণের মধ্যে ফুলে ফেঁপে জোয়ার উঠতে চায়... এ তার চিরন্তন খোয়াব! এবং আজকেই শেষ। সে আর সন্ধেবেলায় সরষে বনে আসবে না। এখন বাড়ি গেলে চিরন্তন শাশুড়ি-বউয়ের কাইজ্যার খোয়াব! আহা! এই কাইজ্যায় যে এত আরাম সমির কোনোদিন জানত ? যখন একজনের প্রতি আরেকজনের আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া, মরেকুটে এক সাথে থাকারই অবচেতন বাসনা... তখনই না লড়াই, তখনই না কাইজ্যা... কিন্তু কমলা এসেছে অব্দি... চলে গেছে অব্দি মেঘের মধ্যে রক্ত রক্ত রঙ... সেই রঙ সরষে বনকে পর্যন্ত আহত করতে পারে।

সমিরের দুই পা ঘাস মাটির ঠুয়া খেয়ে খেয়ে বাড়ির পথ ধরার কথাই ভাবে।

amarboi.com

এসপার উসপার যা-ই হোক, ওকে এখান থেকে নড়তে হবে। শূন্য হাত, শূন্য মাথা... ফাঁকা... সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখবে সেই একই দৃশ্য... রেজিনা উঠানে ঝাড় দিচ্ছে, আর তার কানা মা চিৎকার করে যাচ্ছে... অ বউ... বউ বাতি দিয়া গেলি না ? সেই ঝিম ধরা সর্দিমাখা আওয়াজে ধ্যানী প্রকৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার বউ রেজিনাও... দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নিশ্চয়ই উত্তর দিচ্ছে... কানা বুড়ির খায়েশ কী! বাতি ছাড়া পথ দ্যাহে না। চিৎ হয়া পৈরা খালি বাত খাওন, আর মাগরিবের অক্তে বাতির লাইগ্যা চিক্কোর... সমির প্রতিদিন দেখে এই দৃশ্য...। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হাত চলে যায় রেজিনার চুলের গোড়ায়... আর রেজিনা ডাক দিয়ে চিৎকার করে সাত গ্রামের মানুষ জড়ো করে। এরপরেও হররোজ মাগরিবে এক প্যাঁচাল। কপাল থাবড়ে সমিরের মা নিজের অদ্দিষ্টকে অভিশম্পাত করে। অই অলক্ষ্মী বউ, কতদিন কৈছি মাগরিবের অক্তে উঠান ঝাড় দিবি না। মাগির কানে কি বাতাস যায় না ? এই বাড়িত কি কুনোদিন লক্ষ্মী আইব না ? রেজিনার ডাঙর কণ্ঠ— তুই মরলেই আইব। কানা বাড়িত কুনদিন লক্ষ্মী আহে ? কেউ হুনছে ?

সমির যখন বোধ করে তার প্রসারিত পা তার উঠোনে— তখনই তন্ত্রীর জাল ছিঁড়ে যায়। সমির সেই সরষে আলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রতিদিনের জাগতিক পা খোয়াবের মধ্যে দিয়ে টেনে টেনে তাকে বাড়ি পর্যন্ত হ্যাঁচড়ে নিয়ে ছিল।

সে কুদ্দুসকে কিছু একটা বলার জন্য খোঁজে! সামনেই তো বসেছিল লোকটা। ভয়ে ছাই হয়ে আসে সমির... কুদ্দুস... স... স...। না ? গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ওই তো দূরবর্তী আমগাছের নিচে কুদ্দুসের অপসৃয়মাণ ছায়া। ধপাস করে বসে পড়ে সমির... আদৌ কি কুদ্দুস এসেছিল ? শীতে কুঁকড়ানো গুটি বেরোচ্ছে সমিরের দেহে। কুদ্দুস যদি বলে কাইল হাঞ্জায় আমি গেরামেই আছিলাম না...। সমির কি তারপরও বেঁচে থাকবে ?

লক্ষ্মীপেঁচার এই সংবাদে অমলা রাণীর বাড়ির লোকেরা মুহূর্তে অনন্তর শোক ভুলে যায়। লাঠিটাকে চরকি নাচন ঘুরিয়ে পেঁচাবুড়ি উত্তরের গ্রামের দিকে ছুটে যায়। তার উড়ন্ত দেহের দিকে চেয়ে গলায় দম আটকে বসে থেকে শাশুড়ি-বউ দুজনেই অকস্মাৎ নড়েচড়ে ওঠে।

এদিকে গেন্দা পাশের বাড়ির গেন্দির সাথে চরকি নাচন খেলছে। দুইজন এই দুনিয়াতে নেই... কেবল পাক খাচ্ছে।

ওই গেন্দি তর মাতার ফিতা কই ?

কাউয়ায় নিছে।

কুন কাওয়া ?

কালা কাওয়া।

কালা ক্যান ?

কপাল দুষে।

ফিতা ক্যান ?

হিঃ হিঃ হিঃ গেন্দি হাসে, কালা কাউয়া হেই ফিতা তার বউয়ের মাতাত বানব...।

ক্যান বানব ?

সন্ধ্যার নিথর রোদছায়া ছিন্ন করে চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ি শাশুড়ি, হারামজাদারা, গেলি!

গেন্দা-গেন্দি নাচতে নাচতে উঠোন পেরিয়ে অনেক দূরে চলে যায়, সরষে বনের ঘেরান তাদের টানতে থাকে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তারা ভূতগ্রস্ত সমিরকে দেখে। পষ্ট মনে হয়, ওর মাথার ওপর ঠাটা পড়ছে।

মিশমিশে ভয়ে ফিসফিসে স্বরে গেন্দি বলে— ডর করতাছে। গেন্দা বলে— ল'পলাই।

দৌড় দৌড়!

এদিকে ঠাণ্ডা চুলোর পাশে নিথর বসে থাকা দুই নারী পরস্পরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। কমলাসুন্দরী ? ধুর! তাহলে লক্ষ্মীপেঁচা ? না, অন্য কেউ হলে বলা যেত গ্রামবাসীর সাথে মশকরা করছে, অথবা ভুল দেখেছে। পেঁচা বুড়ির কখনো ভুল হয় না। সে সত্য বলে, গ্রামে কলেরা এলে প্রতিটি ঘরকে সাবধান করে দেয়, নিজে গায়ে খেটে অন্যের সাহায্য করে। কমলাসুন্দরী গ্রামে আসা মানে এই গ্রামে ঘোর অকল্যাণ... জ্বরে-আতঙ্কে অমলা রাণী শাশুড়ির হাত চেপে ধরে, আমার কেমুন জানি তহনই সন্দেহ লাগছিল— কমলা মরে নাই!

তয় রামদাস চিতায় উডাইল কারে ?

এই সূত্র ধরেই ঘোর অকল্যাণ আসবে। প্রভাবশালী যদি জানেন কমলা বেঁচে আছে, সারা গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেবে না ? আর রামদাস ? ওর দশা কী হবে ?

শাশুড়ি-বউ কেউই সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের কথা ভাবতে চায় না।

অমলার সান্ধ্য মুহূর্তের স্মৃতি কোথায় কোথায় যে হাঁটে। কমলার জন্য পাগল ছিল এই গ্রামের বেশির ভাগ যুবকেরা। কমলার মায়ের সাথে অমলা রাণীর জানিজান খাতির ছিল। ধর্মে বর্ণে মিল থাকায় তারা দুজনই চাইত, কমলার সাথে অনন্তর বিবাহ হোক। রাধারাণী প্রায়ই ভয়-আতঙ্ক স্বরে বলত, দিদি, মাইয়া তো না ঘরে একটা আগুন রাখছি। কুনদিন যে বেবাক ছারখার কৈরা দেয়! অনন্তও জানত সেই কথা। সে কমলার সৌন্দর্যে এমন মজে ছিল, মিনিট মিনিট প্রহর গুনত, কোন মুহূর্তে এই সাংঘাতিক স্বপ্নটা সফল হয়। সারাক্ষণই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঘোরে থাকত সে। কেননা কমলার চোখে অনন্ত তাচ্ছিল্য দেখেছে বহুদিন। অনন্ত দেখতে

ভালো। ওর মুদির দোকানের আয়-রোজগার ভালো। বংশে বংশে মিল আছে—এইসব বাদ দিয়ে কমলা কোন সে টানে দেখতে কালো চিকনা চাকনা সমিরকে এত পাত্তা দিত, অনন্ত ভেবে কূল পেত না। যদিও দুইজনই ছিল খুব চালাক, প্রকাশ্যে কখনই তারা এমন কোনো মেশামেশি করত না যাতে বোঝা যায়, বাল্যপ্রেম ছাড়িয়ে দুইজন যৌবন প্রেমে পড়েছে। তারপরও গ্রামের মানুষের কানাঘুষা থেকে এবং কমলাকে তক্কে তক্কে লক্ষ রেখে বিপন্ন হয়ে আবিষ্কার করত, গ্রামের সব পুরুষকে কমলার এই তাচ্ছিল্যের মূল কারণ সমির, কমলা সমিরের প্রেমেই মজেছে। অনন্তর মাথায় আগুন ধরে যেত। কমলা যেরকম মেয়ে, কোনো রাজপুত্রের বউ হিসেবেই ওকে মানায় ভালো। সেক্ষেত্রে আর যাই করুক কমলা অনন্তকে সব দিকে ছাপিয়ে যাবে এমন একজনের সাথে সম্পর্ক করলে অনন্তর জ্বলুনি কিছু কমত। নারীজাতির রুচির লীলা বোঝা ভার। কোন লীলায় যে কার পিরিতে মজে! লীলা! হয়তো এটা কমলার এক ধরনের খেলা। সুন্দরী নারীদের যা হয়, চারদিক থেকে অধিক তোয়াজ পেতে পেতে নিজের পছন্দটা খুঁজে পায় না।

আকথা কুকথায় কান দিয়ে নিজের সন্দেহবাতিক শকুন চোখকে বিশ্বাস করে অনন্ত হয়তো কমলাকে ভুল বুঝেছে। নইলে দুই বাড়িতে যখন বিবাহের কথা উঠছে, তখন কমলা নীরব কেন? সে তো সমিরের পক্ষ নিয়ে ফোঁস করে দাঁড়িয়ে পড়তে পারত। ম্যাদামার্কা সমির কিছুতেই কমলার প্রেমিক হতে পারে না।

এ-তো গেল অনন্তর এক দিকের ভাবনা। এখন বিবাহ থেকে শুরু করে কমলার সাথে অনন্তর মিলিত হওয়ার স্বপ্নে ঘোর অবিশ্বাসে অনন্তর গতরে যে আসমান জমিন জ্বর উঠতে থাকে তার উপশম কে করে? কমলা অনন্তর বউ হবে, আসমানের পরীকে সে নিজের কব্জার মধ্যে পাবে, এত যোগ্যতা অনন্তর কবে জন্মাল? খোয়াব! দুই পরিবারের এ মিথ্যা স্বপ্নের খেলা। এর মধ্যেই একদিন তক্কে তক্কে থেকে অনন্ত অভিনব কায়দায় নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। দিঘি থেকে ডুব দিয়ে বাড়ি ফেরতা কমলা তখন ভেজা শাড়ির তলা থেকে ফুটে বেরোচ্ছে। তাল হারিয়ে দিঘি ফেরতা সেই যৌবনের দিকে বেক্কলের মতোন তাকিয়ে ছিল অনন্ত।

চোখে কটাক্ষ ফাটিয়ে চিরদিনের শান্ত মেয়েটি হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে, গাছে বেল পাকলে কাওয়ার কী? কাওয়া? আমি কাওয়া? বিছানায় শত শত লাল পিঁপড়ে, জেদে, ক্রোধে, যন্ত্রণায় অনন্ত ভূতের মতোন বসে থেকে অসহ্য রাত্রি পার করে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত... একদিন মওকা মেলে। বাটিতে করে অমলার অতি সাধের কাঁঠাল বিচির লতা চিংড়ি নিয়ে এসে শূন্য বাড়িতে হাঁক দেয় কমলা। অনন্তর মা-বাবা সবাই মিলে দু'দিন হয় অনন্তর নানার বাড়ি গেছে। এই খবর জেনেও খালি বাড়িতে কার জন্য সালুন পাঠায় কমলার মা? মেয়েটার

উঠোনে মরা নখের কোনা দিয়ে মাটি ঘষটানো দেখেই অনন্ত বোঝে, ও চরম অনীহায় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই বাড়িতে আসে। কমলার যে বিষয়টা অনন্তকে সবচে' বেশি আকৃষ্ট করত, তা ছিল ওর কঠিন সতীত্ববোধ। কমলা বোধ করত একটা মেয়ের সতীত্ব গেলে এরপর জীবন যায় কলা গাছের ফেউশ্যার মতোন অর্থহীন, বমির মতোন এঁটো। বাড়ির লোক যা-ই করুক, কমলার জেদ অনন্ত জানে, সে কিছুতেই অনন্তর ঘরে আসবে না। শেষ মুহূর্তে হলেও এর বিরুদ্ধে সে ভয়ঙ্কর রূপে জ্বলে উঠবে। সেই কমলার দেমাক-অহঙ্কার মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয়ার একটা পথ, ওকে অদিনারী করে দেয়া। সেই সতীত্ব যদি অনন্ত হরণ করে, তবে তাকে বিয়ে করা ছাড়া কমলার আর পথ থাকবে না।

শিকারি টিকটিকির মতোন দরজা ভেজিয়ে তক্কে তক্কে বসে থাকে অনন্ত। 'বাড়ির বেবাকে মরল নাকি?' বলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দ্রুত দরজার ছিটকিনি তুলে বিছানায় ফেলে দেয় সে কমলাকে।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কমলা অনন্তর বুকের নিচে শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এদিকে কাণ্ডটা শুরু করার পরই অনন্তর মধ্যে এক বিশ্রী ধিক্কার ওঠে, সাথে মরণ ভয়। এ-কী করতে যাচ্ছে সে? সমাজের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে যে বিবাহ, তাতে কি দুইজনের কিছুমাত্র সুখ হবে?

এদিকে আচমকা এই পরিস্থিতিতে পড়ে কমলা এক বিন্দু রা করে না। অন্য কোনো মেয়ে হলে এই পরিস্থিতিতে চিৎকার করে সারা বাড়ির লোক এক করত।

কমলা নিচু থেকে অনন্তকে ওপর দিকে ঠেলতে ঠেলতে যখন বলছে—চিল্লানিডা দিলাম না। বাপ-মায়ের ধাক্কায় হেষে যদি তুমারেই বিয়া করতে হয়...? তখনই ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে নিজের ঘর্মাক্ত ছেলের এক্কেবারে ভিজা কাউয়া হয়ে যাওয়া অবস্থাটা দেখে অমলা রাণীর রক্ত শীত হয়ে আসে। ওকে এই অবস্থা থেকে বাঁচায় কমলা-ই, তুমার বাপ-মা আইস্যা গেছে মনে হয়। তুমি তাগোর লগে দরবার করো, আমি পিছন দরজা দিয়া গেলাম।

জাদুকরী!

রাক্ষসী!

কমলাকে এই জীবনে পাওয়ার ইচ্ছা অনন্তর মধ্যে আরো কঠিন প্রবল তোড়ে এক্কেবারে ধিকিধিকি উজানে বইতে শুরু করল। নির্ভে যাওয়া চুলোতে ফুঁ দিয়ে কোন ভাবনায় যে অমলা কাঁদে! অনন্তর পথের দিকে তাকিয়ে সে তার সই রাধারাণীর পরিবার নিয়ে ভাবে। কমলা যদি বেঁচে থাকে, তবে রামদাস কার লাশ চিতায় উঠিয়েছিল?

এখন কমলা যদি বেঁচে থাকে তবে গ্রামের প্রভাবশালীর হিংস্র বিকট চতুর ছোবলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে না রামদাস আর রাধার দেহ?

amarboi.com

আসমানের লাল মেঘ নিঃশব্দে বইছে।

অমলার শাশুড়ি বড় ভয়ার্ত স্বরে বলে— আইজকি সূর্যি ডুবব না ? কুন সময় হাঞ্জা হইছে... বেলা আন্ধ্যার অয় না কেনরে বউ ?

সন্ধ্যার এ হেন রূপ দেখে নানা আশঙ্কা কলজে খাবলে ধরে, অমলা রাণীর মনে হয় অনন্তর লঞ্চ ডুবে যাওয়া, কমলার জীবিত হয়ে ফিরে আসা, একটা রক্তাক্ত সন্ধ্যার এক জায়গায় আটকে থাকা, প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটার যোগসূত্র আছে। সন্ধ্যা যদি না নেভে, যদি রক্ত খেয়ে কেবলই ঢোল হতে হতে রাত্তিরের জন্য সন্ধ্যার অপেক্ষা করতে হয়, তবে রক্তমোটা মশার মতোন ফটাস ফেটে যাবে, লহু গড়াতে থাকবে, এরপর মহাপ্রলয় হবে। সাথে সাথেই সে ভগবানকে ডাকে। চিরজীবনের জন্য শাশুড়ির সাথে বিদ্বেষ কেটে যায়। অনন্তর বউ গোসা করে সেই যে বাপের বাড়ি গেছে, ফেরার নামটি নেই। এদ্দিন ছেলের মা হিসেবে কোমরে আঁচল গুঁজে বসেছিল অমলা রাণী, বউ না আসলে ফের অনন্তকে অন্যত্র বিবাহ দেবে। তারপরও পরানের গহীন মাঘ যায় না। অনন্তর মন থেকে কমলাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল যে নারী, তাকে এখন ভীষণ সুন্দরী মনে হচ্ছে অমলা রাণীর। এখন অনন্ত বেঁচে আছে— মনের মধ্যে এইটাকেই কঠিন বাস্তব করে অমলা রাণী জীবনের বাকি অংশগুলো কষে। এক্ষণ এক্ষণ অনন্তর খবর নিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি লোক পাঠানো দরকার। অনন্ত বেঁচে যদি ফিরে আসে, স্ত্রীহীন খালি ঘরে প্রেতের মতোন মুহূর্তে জায়গা করে নেবে কমলাসুন্দরী। এ-তো হতে দেয়া যায় না।

তাছাড়া আটকে যাওয়া সন্ধ্যাটার পথ ধরে কেন অনেকক্ষণ যাবৎ একই তালে বইছে উত্তরের মেঘ ? বাতাস তার সাথে মুচকি ফুর্তিতে মেতেছে ? এই দিনটাকে কোনো কিছু দিয়েই অন্যসব সহজ স্বাভাবিক দিনের সাথে মেলানো যায় না।

কী বলে গেল লক্ষ্মীপেঁচা ? কী বলে গেল ? নুসরাত বানু মাথায় ঠাটা পড়া মানুষের মতো তার সামনের মাটিতে বসে থাকা দুই নারীর গোল হয়ে আসা চোখের দিকে তাকায়।

কী তাজ্জিব কতা! কমলাসুন্দরী আইছে ? আঙ্গুরীর জিভ বিস্ময়ের চাপে ভারি হয়ে আসে। শরীরে থর কাঁপুনি শুরু হয় নুসরাত বানুর। লক্ষ্মীপেঁচা বলে কথা! ও কখনো ভুল খবর দেয় না। নুসরাত বানু হতভম্বের মতো তার শরীর কামড়ে থাকা

মূল্যবান অলঙ্কারাদির দিকে তাকায়। এতক্ষণ যে দ্রব্যগুলি তাকে বেহেস্তের পরীতে রূপান্তরিত করেছিল, সেইগুলোই এখন বিচ্ছু, অথবা লকলকে সাপ হয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরছে। কমলাসুন্দরী বেঁচে আছে ? যদি তা-ই সত্যি হয়, তবে সে সামনের ছিন্ন হতশ্রী নারী দু'টির কাছে ভিখিরির অধম কোনো নারী। ওরা নুসরাত বানুর অলঙ্কার ফুটানি নিয়ে বাইরে গিয়ে রঙ্গ করতে করতে হাসবে— আগে তর ভাতারকে সামলা, পরে ফুটানি করিস!

কী কৈল পেঁচা বুড়ি ? নিজের কানের প্রতি শেষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতোন সন্দেহ প্রকাশ করে নুসরাত আঙ্গুরী-আলেয়াকে প্রশ্ন করে। এদিকে বজ্রাহতের মতো ওরাও বেকুব হয়ে তাকিয়ে আছে নুসরাত বানুর দিকে। যে কমলাসুন্দরীর লাশ দশ গেরামের লোকের সামনে রামদাস চিতায় উঠিয়েছে... সে কী করে ফিরে আসে ?

আঙ্গুরী বলে— পেঁচাবুড়ির কতা...!

আলেয়া বলে— আরে বয়স হৈছে না পেঁচার। আগের মতোন বেবাক বেলাতেই বেবাক কিছু ঠিক ঠিক দেখব, ঠিক কৈব, হের বিশ্বাস কী ? ওর চক্ষেও তো ছানি পড়ছে। আহা! বড় মধুর আলেয়ার কথাগুলি— মুহূর্তের জন্য কলজেটার মধ্যে আরাম হলে অতি আবেগে নুসরাত বানুর মনে হয়, হাতের দুটো বালা আলেয়াকে দিয়ে দেয়। পরক্ষণেই গভীর যন্ত্রণায় ফালাফালা হয়ে যায় নুসরাত বানুর বুক। লক্ষ্মীপেঁচাকে সে দেখেছে, তার অভিব্যক্তির কোথাও কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না। এতকাল পর বুড়ি যদি কমলাকে না দেখে তার জিনকেও দেখে থাকে, সেটা সত্য। বুড়ির দেখার মধ্যে কোনো ভুল হতে পারে না। কমলা না এসে তার জিনও যদি আসে... সে-তো আরো ভয়ঙ্কর। অপঘাতে মরে যাওয়া জিন তো প্রথমেই গ্রাস করবে নুসরাত বানুর স্বামী প্রভাবশালীকে। কী পাগল প্রেমেই না পড়েছিল প্রভাবশালী! প্রথম বিবি জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি বিবাহ না করে কমলাকে রক্ষিতা হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন বিনিময়ে রামদাসের ভাঙা বাড়িতে প্রাসাদ উঠবে। অলঙ্কারে মোড়ানো রাজেশ্বরী হয়ে থাকবে কমলা। তখন রামদাস ছিল প্রভাবশালীর পা চাটা চাকর। সব শুনে বাজ পড়ে রামদাসের মাথায়। কিন্তু কমলার দিকে তখন শকুন চোখ তাক করে ফেলেছে প্রভাবশালী। কমলার জেদ তখন নাগিনের চেয়ে ফোঁসফোঁসিয়ে উঠছে। সমির ছাড়া কাউকে সে চেনে না। প্রভাবশালী ওর চুলের ডগা স্পর্শ করলে মাথায় কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করবে সে।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর দশদিনের মাথায় কমলাপাগল প্রভাবশালী কমলাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়। এর দু'দিন পরই কমলা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

এইসবই নুসরাত বিয়ের পরে পই পই করে গ্রামের দশজনের কাছে শুনেছে। লোকটি ঘুমের মধ্যেও কী প্রেমে কী জেগে কমলার নাম স্মরণ করে কঁকিয়ে উঠত। এরপর 'কমলা মারা গেছে' এই বিষয়টা গ্রামের সবাই দেখলে এই বিষয়টার জাগতিক নিষ্পত্তি ঘটে। বিয়ের আগেই অবশ্য নুসরাত বানুর বাড়ির ওপর বয়ে যাওয়া কুয়াশার পরত পরত শুঁকে কমলাসুন্দরী বৃত্তান্তের ভাসা ভাসা অনেক কিছু শুনেছে সে। শুনেছে, নুসরাত যার স্ত্রী হতে যাচ্ছে তিনি নিজের হাতে প্রথম 'কমলার' খোসা খুলে কোয়াগুলো সারাজীবন ধরে মৌজ করে খেতে চেয়েছিল। শুনেছিল বেশ্যাদের প্রভাবশালী ঘৃণা করে, কেননা তারা অনেক পুরুষের সাথে শোয়। প্রভাবশালী নিজের স্ত্রী ব্যতীত একমাত্র কমলাতেই আসক্ত হয়েছিলেন। আরও দু'চারটা খুচরা নারী বিষয়ক খবরও বাতাসে আছে, তবে সেগুলোর সব ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী ছিলেন প্রথম মানুষ।

পুরুষদের এরকম দু'চারটা দোষকে সমাজ তো ক্ষমার চোখেই দেখে। এর মধ্যে প্রভাবশালী হলো বলতে গেলে গ্রামের রাজাবাদশাদের মতোন একজন। সে-তো ধর্মমতেই চারবিবি ঘরে রেখে চারজন রক্ষিতা পর্যন্ত পোষার তাকদ রাখেন। এছাড়া প্রভাবশালীর সবচে' অভাবনীয় প্রশংসার দিক ছিল, সে একজন বয়স্কা স্ত্রী ঘরে রেখে দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। সেই মানুষের চোখ কমলার দিকে গেলে দোষের কী ? কমলা তো চোখ যাওয়ার মতোনই ডাগর কন্যা, নাকি ?

সব শুনে কমলার প্রতি মরণ ঈর্ষা, আর স্বামীর প্রতি কঠিন ভয় নিয়ে বিবাহে বসেছিল নুসরাত। ছেলেবেলায় বেশি লাফঝাঁপ পাড়লেও মেয়েদের সতীচ্ছেদ ফেটে যেতে পারে এটা নুসরাত জানে। কিন্তু সে জন্ম থেকেই চিরশান্ত মেয়ে। স্বামীর এহেন অসূর্যস্পশ্যার প্রতি খায়েস দেখে সে যমজ্বরে পুড়ে মরে। তার বয়স যখন চৌদ্দ তখনই এক কঠিন অন্ধকারে তাকে ফুসলে, ভয় দেখিয়ে তাকে ভেঙে চুরে তার বড় বোন জামাই তার মধ্যে কঠিন রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তারপর সেই মানুষই তাকে মুছে তকতকে করে স্ত্রীকে নিয়ে শহরবাসী হয়েছে। এরপর থেকে যতবার বোন আর তার জামাই আসে— নুসরাত লাপাত্তা। ত্রিসীমানায় তাকে কেউ খুঁজে পায় না।

এখন নারীর সতীত্বের প্রতি এত যার টনটনে চোখ সে কী করে বিবাহ বিছানায় নিজেকে সতী প্রমাণ দেয় ? দাদিজানের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে নুসরাত বানু তার সোহাগের দুলাভাইয়ের কীর্তির বয়ান করে। শুনে দাদিজান সাক্ষাৎ গোখরো। পারলে ছোবল দিয়ে দিয়ে ভুস্তিনাশ করে দেয় নুসরাতের। তার ভাষ্য, নারী হৈল আগুন, পুরুষ ঘি... হেই পুরুষ থাইক্যা দূরে থাকবি না ? তুই সতী হৈলে হের সাধ্যি কি তরে জুটা বানায় ?

যা হোক, সে-ও প্রাচীন নারী। নিজেকে রক্ষা করার নানা কায়দা ফিকির করে করে বয়সের এই প্রান্তটায় এসে পৌঁছেছে।

কী ভয়ঙ্কর বাসররাত। ভাবলে এখনো নুসরাতের কলজে ছিঁড়ে যায়। কৌটোয় মুরগির রক্ত নিয়ে স্বামীর সাঁতারের সময়টাতেই নিজের সাধ আহ্লাদ ভুলে তক্কে তক্কে ঢেলে দেয় বিছানায়।

স্ত্রীর সতীত্বে অভিভূত প্রভাবশালী প্রথমদিকে কমলা আক্রান্ত থাকলেও এক সময় কমলাকে কেটে ছেঁটে নতুন জীবন শুরু করে।

জানালা দিয়ে রক্তলাল আসমানের নিচে আটকে থাকা সুনসান গ্রামটাকে দেখে কে বলবে, এই গ্রামে একজন মৃত নারী জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছে ? নুসরাতের ধিকধিক আত্মা এক সময় দেউরির মুখে দাঁড়িয়ে আধপাগল প্রার্থনায় রত হয়— মিছা হউক সব, মিছা হউক!

ইহজগতে, আসমান তারায়, পবন বায়ুতে কুথাও কমলাসুন্দরী নাই।

কী এক অজানা ভয়ে সমির আলী কেটে ফেলা সরষের ফুলগুলো ক্ষেতের মাটিতে আটকে থাকা গাছগুলোর সাথে আটকে দিতে চায়। সন্ধ্যায় ঘাস কেটেই সে সর্বনাশ করেছে। রেজিনার পেটের আবু মাগরিবের অক্তে সরিষার ফুল খেতে চায়, পাতা খেতে চায় ? এই আবুই খবিস, রেজিনার পেট থেকে একটা ট্যাটনা শয়তান জন্ম নেবে। গৃহ, স্ত্রী, সন্তান কিছুই তাকে ঘরের দিকে টানছে না। মনে হচ্ছে অনন্তকাল সে এই সরষে বনে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনই মোহ জাদু বিস্তারকারী সেই আকাঙ্ক্ষা, সমিরের মনে হয়, সে এই সরষেমালার সাথে বেঈমানি করেছে। এদের মস্তক, ডালপালা কেটে সে অভিশপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও ওই যে ওপরে প্রবাহিত হয়েছে লহু শ্বেত মেঘ... এরা কেবলই এই সন্ধ্যার পথ ধরে প্রবাহিত হতে থাকবে। এই ধারার কোনো শেষ নেই, সন্ধ্যার আসমান আর এই জীবনেও মেঘহীন ফকফকা হবে না।

দুই হাতে মাটি খামচে ধরে সমির আলী।

তখনই কলজের মধ্যে বল্লমের ঘা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে স্মৃতি!

সেই সন্ধ্যায়, যে সন্ধ্যায় তাজা রক্তে ছটফট করছিল মেঘ, সরষে বনের কোনো অজানা কুহকের মায়াজাল আজকের মতোই গহীন আসমানের নিচে

amarboi.com

আটকে রেখেছিল সমিরকে... হারানোর বেদনায় নিরবল হয়ে বুক চেপে হাহাকার আটকে কেবলই খুঁজছিল, কোন সেই প্রাণের ধন, তাকে অবাধ জমিনের ফাঁদে আটকে উড়াল দেবে!

বাড়ি ফিরে সারারাত ছটফট... জ্যোৎস্নার নহর বইছিল গ্রামের পর গ্রামের মাঠে-প্রান্তরে। ফাঁপর উঠা বুক নিয়ে সে দিঘিপাড়ের কাঁঠাল গাছটার নিচে বসে নিজেকে জলের মধ্যে স্থাপন করতেই রক্তাক্ত ছায়া সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। আহা! আহা! সইরষা বনের আসমানের মেগ রাঙা ক্যান ? তুফান কই ? তুফান ? হাঞ্জার মেগ চান্দের পহরে সোনার লাহান হৈব, লহুর লাহান ক্যান ? চান্দের আলোতেও হেই মেঘ হাঞ্জার মতোই থির; সমিরের কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দাস বাড়ির ইনানো বিনানো কান্না ভেসে আসে ততক্ষণে! সটান দাঁড়িয়ে তারপরও ঘুনসির ঘোরে পড়ে সেই সর্বনাশা মেঘের কলজে ভেঙে দেয় যাতে উত্তরের তুফান... তাকেই চিৎকার করে ডাকে সে।

দাস বাড়িতে কান্না কেন ? কমলা মরে গেছে ? পরদিন যখন জানা গেল ডহর রাতে কমলা গেরাম ছেড়ে অজানা জগতের পথে পালিয়ে গেছে, তখন সমিরের বুকের ধিকিধিকি আত্মা দুমড়ে উঠেছিল। আহা! মরল না ক্যান ?

ক্যান কমলা রাণীর দিঘির তলে হারায়া যাওনের গল্প ? সমিরের তব্দা জীবনের সেই সময়ে সে নিজের আউলা মাথাকে সুস্থির করতে খুব বাজে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। নেশাটায় আসক্ত হয়ে, অন্য নেশাখোরদের সাথে ভেদ রহিত হয়ে পুরনো বটগাছের তলায় মোম জ্বালিয়ে হেরোইনের তালিম নেয়, তালিমই তো, একি আর মদ বিড়ি ? টান দিয়ে গিলে ফেললাম, চুমুক দিয়ে পেটে ফেললাম। আসলে সেই সময়টায় সমির আলী কমলাসুন্দরীহীন গ্রামটার হাহাকারময় শূন্যতাকে নিজের গতরে নিয়ে আমগাছে ঝুলে পড়ার মুহুর্মুহু স্বপ্ন দেখত। যেখানে গ্রামের বেশির ভাগ চাষা এবং হাভাতাদের বাঁচার স্বপ্ন একটাই— খাদ্য, সেখানে প্রেমের তোপে মরতে বসা সমির আলীর নাম হয়ে উঠেছিল মাজাভাঙা মজনু।

কে বলেছিল, হেরোইন খেলে মাথা থেকে সব উবে যায় ? সমির আলী মদ খেয়ে দেখেছে কেউ যেন দুঃখের ধিকিধিকি আগুনে খ্যাংড়া কাঠি ঢুকিয়ে দেয়। দুঃখ সারা দেহে শরীরে ছড়িয়ে উজান কান্নায় আধপাগল করে তোলে। হেরোইনের কায়দা রপ্ত করা কঠিন। সিগারেটের রাংতার শাদা কাগজটাকে খুব সাবধানে পুড়িয়ে রুপালি রাংতায় রাখতে হয় আধচিমটি হেরোইনের গুঁড়ো। খাঁখাঁ প্রান্তরের অন্ধকারে একজন রাংতাটা হালকা করে মোমের শিখার ওপর ধরে রাখতে হেরোইন গলে ওঠে, সাথে সাথে দুই টাকার পেঁচানো নোট দিয়ে সে ফুঁ দিয়ে সেই গলিত অংশে টান দিয়ে বিষয়টাকে গিলে সঙ্গে সঙ্গে দেয় সিগারেটে

টান... মাথাটা পয়লা পয়লা ভারি লাগে, ফাঁকা লাগে... সমিরের মাথায় তখন কমলা নামানোর ভূত... টানছে টানছে... শেষে দাঁড়াতেই মাথাটা এমন বেঁন বেঁন করে ওঠে বমির পর বমি দিয়ে সে ঘাস-মাটি ভিজিয়ে ফেলে।

এরপরও সে যেত। নানা ফন্দি-ফিকির করে পয়সা যোগাড় করে চেতন অবচেতন মরার মতো পড়ে থেকে জীবনটা পার করার জন্য যেত, তাতে মাথার মধ্যে কমলা আরো নব নব ছিরিবিরি সাজে মাথার মধ্যে পেখম মেলে নাচার জুৎ পেত। আধস্বপ্নে পাওয়া কমলাকে প্রভাতে হারিয়ে যখন সমির পাটখড়ির মতো হয়ে উঠছে, সাতদিন পর এক সন্ধ্যায় খবর এলো দূর গাঙে এক নারীর লাশ ভেসে উঠেছে।

দূর গাঙে ভেসে ওঠা অজ্ঞাত পরিচয়হীন সেই লাশের সন্ধানে রামদাস তো বটেই, গ্রামের প্রায় অর্ধেক মানুষ ছুটে যায়।

কেবল মাটির বহু তলায় শেকড় ছড়ানো গাছের মতো বটের তলায় বসে থাকে সমির আলী।

সে এক সময় গেছে রামদাসের। প্রভাবশালীর ক্রীতদাসের জীবন। শরীরে তাগদ ছিল কিন্তু পেছনে শিরদাঁড়া ছিল না। ছিল রামদাসের এক পালোয়ানের মতোন বড় দাদা। রামদাসের মিনমিনে স্বভাব দেখে যা-ই সম্পত্তি ছিল বাবা দিয়ে গিয়েছিল সেই বড় দাদার নামেই। বড় দাদার ওমের তলে বেড়ে ওঠা রামদাস এইসব সম্পত্তির হাঙ্গামায় না গিয়ে নিশ্চিন্তেই ছিল, ভালোই ছিল। কিন্তু প্রভাবশালী আর বড় দাদার হাঙ্গামার এক পর্যায়ে প্রভাবশালী কী-না কী কাগজপত্র কোর্টে দাখিল করে লড়াই করতে করতে যখন রামদাসদের সম্পত্তি কুক্ষিগত করে ফেলেছেন প্রায়, তখনই বড় দাদা স্ট্রোক করে মারা যায়। সম্বলহীন, মেরুদণ্ডহীন রামদাস কাজ নেয় প্রভাবশালীর বাড়িতে।

সে-ও বহুকাল আগের কথা।

রামদাস!

জে!

আমারে যে অজুর পানি দেস, তর গুনা অয় না ?

জানি না হুজুর।

আমি যে তর ওজুর পানি নেই, আমার গুনা অয় না ?

জানি না হুজুর।

আমার কইলজাডা কত বড় দ্যাখ! মুহাম্মদ (সঃ) কী কৈছে জানস ? তুমি অন্যের মন্দিরের ভাঙ্গা ইট গাইথা দিও, বিশ্বাস কৈরো না। তুই বেধর্মী, আমার কাম করস, গেরামের কত মানুষ কত কুকতা কয়, আমি কান দেই ?

জি না হুজুর!

কমলাসুন্দরীর বয়স কত হৈলরে রামদাস ?

আজ্ঞে এগারো বারো।

তুষের আগুন বাড়তাছেরে, রামদাস... সামাল দিবি ক্যামনে ?

রামদাস কিছু না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এরপর প্রভাবশালীর সব শব্দ ডুবে যায় গাপি দিয়ে থাকা সকালের কুয়াশাতলায়। তাঁর পা টিপতে থাকা রামদাসের ক্ষিপ্র আঙুল অবশ হয়ে আসতে থাকে। খসখসে করতল জিভ দিয়ে ঘষতে ঘষতে সে দেখে তালগাছে বাউল্যাদের ঝুলন্ত ঘর আর চিল্লাচিল্লি। নিঃশব্দ সকাল পাততারি গুটাচ্ছে। অস্বচ্ছ আলোয় রামদাস স্পষ্ট দেখে সেই দৃশ্য। একরাতে বাইরে গহীন জ্যোৎস্না, খড়ের গাদায় মৃত্যুর শব্দ। সবে রামদাসের বড় ভাই কী কাজে গঞ্জে গেছে। বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। বুড়া লাঠিয়ালের সাথে দলবল। রামদাস লুকিয়েছে গোয়াল-ঘরে। গরুর চাড়ির দুঃসহ গন্ধ-জলে দেহ ডুবিয়ে সে সারারাত পার করে দিয়েছিল। বড় ভাই সব দেখে অজ্ঞান হয়ে সেই যে মাটিতে পড়ল, আর বাঁচল না। হাবা রামদাসসহ ধানী জমি চলে এলো প্রভাবশালীর বাড়িতে। এরপর রামদাসের দাসত্বে প্রীত হয়ে প্রভাবশালী তাকে একটা খড়ের ঘর বানিয়ে দিল।

এই বাড়ির নেড়ি কুকুরটার সাথে রামদাসের সব দোস্তি। কাজ শেষে কাঁঠাল গাছের নিচে শুয়ে কুত্তাটাকে প্রশ্ন করে, কমলার কতা কী কয়রে হুজুর ?

কুত্তা চেয়ে থাকে।

তুষের আগুন বাড়তাছে, ইডার কী মানে ?

কুত্তা চেয়ে থাকে।

কমলারে সামাল দেওয়ার কী আছে ?

কুত্তা কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়ে। এরপর কুকুরটি কাঁঠাল গাছের কোনায় পড়ে থাকা গু-এ মুখ দিলে তার পশ্চাৎ দেশে লাথি দিয়ে রামদাস সোজা প্রভাবশালীর পায়ের তলায়।

রামদাস!

জে!

হাদিসে আছে সর্বদা মুনিবরে সম্মান করিবা। মুনিব হৈল বাপ-মার মতোন। তুই আমারে যে সেবা করস, হেই পুণ্যেই তুই মালাউন হইছস তো কী হৈছে ? তর কতা আমি আল্লারে গিয়া কইমু। তুই আমারে দেখ, সংসারে পুত্র-কন্যা নাই, তা-ও দ্বিতীয় বিবাহ করি না। প্রথমা স্ত্রী হৈল সংসারের লক্ষ্মী। তারে ডিঙাইয়া দ্বিতীয় বিবাহ করা মানে তার দিলে চরম আঘাত দেওয়া। একটা মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান কথা। দ্বিতীয় বিবাহ মানে শান্তির কইলজা কাইটা অশান্তি আর শনির দরজা তৈয়ার কইরা দেওয়া। আমি মূর্খ গো লাহান সেই কাজ করি না। হের লাইগ্যাই আল্লায় আমারে জমির বরকত দিছে! রামদাস!

জে!

কমলাসুন্দরীর বয়স কত হৈছে ?

আজ্ঞে বারো তেরো।

আগুন! আগুন! আমার মাতায় বিষ বেদনা উঠে, তুই ক্যামনে সামাল দিবি ?

দূরে... দূ... রে হজ্জাত। বটগাছের নিচে বসে সমির সেই দূরবর্তী গাঙের মাছি ভনভন ভিড়ের গুঞ্জন শোনে। কার লাশ সেই জলে ? কমলা আত্মহত্যা করেছে ? পচা, গলিত লাশ। কান পরম্পরায় এই শব্দগুলোই চেতনায় এসেছে শুধু। কমলার এত সোনার মতোন গড়ন পচে বীভৎস এক রূপ নিয়েছে ? তমস... কী কঠিন ছোবল সমির আলীর গিঁটে গিঁটে। পা বাড়াতে গিয়ে নিজেকে অবশ বোধ হয়। আজব! সব জমে গেছে। কিসসু নাড়াতে পারছে না সে। হায় কমলাসুন্দরী! এই ছিল তোমার সেই রাতের লীলা ? রাণী কমলার মতোন পানির তলায় হারায়া যাবা ? পরানটা যখন যায় যায় তহন একবারও তুমার মনে পড়ল না, তুমার জানডা তুমার একলার না, তুমি আরেকটা জানেরে লগে লৈয়া মরতাছ! লাশ!

সব বিনাশ হৈয়া গেল।

নাহ্! সে বীভৎস কমলাকে দেখবে। সে কমলার গলিত দেহকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিসফিস স্বরে জানাবে, সে কেবল কমলার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে নি! সে সেই মাংস খাবলে খাবলে নিজের দেহে আত্মায় মেখে মৃত্যু অব্দি দাঁড়িয়ে থাকবে গনগনে সূর্যের তলায়। এইভাবেই নিজের অস্তিত্বের সাথে কমলাকে মেখে সে

amarboi.com

মৃত্যুর দিকে যেতে থাকবে। কমলার গলিত মৃতদেহ চিতায় পুড়বে, তখন সূর্য চিতার তলে দাঁড়িয়ে তিলতিল সহমরণে গিয়ে সে মৃত কমলার আত্মাকে কঠিন শাস্তি দেবে।

ডান পা-টায় ঝিঁঝি ধরে গেছে। সেই নিঃসাড় পথ বেয়ে পিঁপড়ের দল জননেন্দ্রিয় পর্যন্ত এসে পড়ছে। ঝুনো নারকেল আছাড় দিয়ে ভাঙার মতো নিজের অস্তিত্বকে এক সশব্দ কোপ দিয়ে খাড়া করিয়ে সমির আলী দূর গাঙের দিকে ছুটতে থাকে। আলে হোঁচট খায়, কাঁটা ঝোপে পা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, জাওলা মাছের মতো পিছলে পিছলে পাক খেয়ে খেয়ে সমির আলী লক্ষ করে সে একটা বিশেষ ঘোরে পাক খাচ্ছে। কিছুতেই তার জহর মাখানো আত্মা গাঙ অব্দি যেতে চাইছে না। টনটনে আসমানটার নিচে বসে সে কোরাসময় মানুষগুলোকে দেখে। হঠাৎ তার হিম আত্মা ধিক করে ওঠে— লাশটা যদি কমলার না হয় ? এইবার নিজের সাথে নিজের সাপ নেউল যুদ্ধ। সে কী চায় ? এই ভাবনায় মুহূর্তে শরীরের রক্ত দই হয়ে যায়। কমলা তাকে পায়ে মাড়িয়ে বেগানা পথে পা বাড়িয়েছে— এ হলো এক ভাবনা। কমলা নিজের সতীত্ব বাঁচানোর জন্য সমিরের প্রেম বুকে নিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে— এ হলো আরেক। সমির আলী শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঝুরো মাটিতে শুয়ে পড়ে। দূরে মানুষের ভিড় আর চিৎকার। অন্য পাশে সুনসান গ্রাম। আর ওপরে আসমানের পর আসমান। ফাঁকা!

ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তব্দা মস্তক নিয়ে সমির আলী সিধা পথে হাঁটে। এই তো বুকের মধ্যে লহুর স্রোত উঠতে উঠতে মনে পড়ছে সেই সন্ধ্যায়ও হলুদ বনের সাথে আসমানের রাঙা সন্ধ্যাটা মাখামাখি দিছে। সাথে ছিল গহীন কুয়াশা। শীতে সমির আলীর আত্মা ফাটি ফাটি করছিল। স... ব হাংকি মাংকির উপশম হবে গাঙে ভাসা লাশ দর্শনের পর।

ক্রমেই কলরব নিকটবর্তী হচ্ছে।

সমির আলীকে দেখে উৎসবে মেতে উঠা মানুষগুলো টিটকারি দেবে। কেউ কেউ চুকচুক করে তার মাথায় হাত রাখবে। আর যদি মৃতদেহটি কমলাসুন্দরীর না হয়, তাতেও সমির আলী বাঁচবে না। লাশটি কমলাসুন্দরীর— এই ভাবনায় দৌড়ে আসা হুজ্জোত রত গ্রামবাসীরা কমলা আলোচনাতেই মুখর হয়ে থাকবে। সেই অগ্নির মধ্যে এক ফোঁটা ঘিয়ের মতোন টুপ করে খসে পড়বে সমির আলী।

একবার মনে হয় ফিরে যায়।

কিন্তু সেই লাশ-নারী তাকে অমোঘ ফিসফিসে ডাকছে। সমির আলী কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। তার নিশ্চিত করে মনে হতে থাকে লাশটা কমলাসুন্দরীর। আর তা-ই যদি হয় সে সব মানুষের মাঝখান থেকে লাশটাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে দূর গভীর নদীর দিকে দৌড়াতে থাকবে।

কমলাকে সে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে দেবে না।

ওর লাশ স্রোতস্বী জলে ফেলে নিজেও আত্মঘাতী হবে।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ওঠে একদম পরান অতল থেকে। রক্তাক্ত মেঘ ক্রমশ কুণ্ডুলী পাকাচ্ছে। সমির আলী বোকা চোখে শেষ রোদ আর মেঘমালার টালটি বালটি দেখে। দূরে কী যেন কী ভোঁ... শব্দ। ইস্টিমার যাচ্ছে হেই দূর পথের নদী ধরে ? নাকি ইস্রাফিল সিঙ্গা ফুঁকছে! এইবার সরষের গহনঝোপ থেকে সাহস হয় না চোখ তোলার। কমলাকে সে বলেছিল ইস্রাফিলের কথা। এই দুনিয়া ধ্বংসের কাহিনী। কমলা ছিল খাঁটি হিন্দু। এইসব কথা শুনতে শুনতে সে দেবদেবীর ভয়ে কানে আঙুল দিত। ওকে বেহেস্ত থেকে সাপের প্রলোভনে বিবি হাওয়া এবং বাবা আদমকে বিতাড়িত করা হয়েছে, এই কাহিনী বলার পর কঠিন মনোযোগে শুনে সে আচমকা প্রশ্ন করেছিল, এই কারণেই কি সাপের সাথে মানুষের শত্তুরতা ?

এই কারণে।

তাইলে বাঘের লগে মাইনষের শত্তুরতা ক্যান ? সিংহের লগে ক্যান ? কুমিরের...।

তওবা করো কমলা, তওবা করো... সমির কমলার বাহু থেকে ছিটকে সরে গিয়েছিল... সাপ হৈল গিয়া অদিশ্য শয়তানের রূপ... সাপ হৈল মুখোশ... ভিতরে শয়তান... এই সাপই মানুষের পাপ দেখলে ধেই ধেই কৈরা নাইচ্যা ওঠে।

তুমি যে আমারে ভালোবাসো, এইডা তুমার পাপ না ?

কিতা যে কও কমলা, নর-নারীর ভালোবাসায় মাতার উপরে পুণ্য আইস্যা বসে।

আমি যে হিন্দু...।

তুমারে আমি মুসলমান বানাইমু।

আর্ত চিৎকার গিলে সেইদিন থেকেই মূলত কমলাসুন্দরী সমির আলীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল। সেইদিন থেকেই তার মুখে রাণী কমলার কাহিনী।

ক্রমশ এই বিষয়টা মনে হতে থাকলে সমিরের জমাট রক্ত ছেড়ে যেতে শুরু করে। কমলা কি সাপটাকে অবিশ্বাস করেছিল, নাকি ভয় পেয়েছিল ?

নুসরাত ভাবে, কমলাসুন্দরী যদি সত্যিই গ্রামে এসে থাকে তবে সে এই সন্ধ্যার আমগাছে ঝুলে আত্মঘাতী হবে। স্বামীকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। রামদাসকে তুলোর মতোন বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সে কমলার চুলের গোড়া চেপে এই বাড়িতে এনে উঠাবে।

দেউরির ওপারে কেবল সন্ধ্যা।

সারাটা গ্রাম আজ মরে গেল নাকি ?

না, কমলা আসে নি। এই সবই লক্ষ্মীপেঁচার ভুল। স্বামীকে ঘরে ফিরতে না দেখে রেজিনার মধ্যেও লড়াই শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। নুসরাত বানুর মতোন তারও যন্ত্রণা, ভয়, ঈর্ষা, দ্বিধা। বুড়ি শাশুড়ির চিৎকারে আজ কোনো বিকার নেই শরীরে। সেই কখন গেছে স্বামী সরষে শাক তুলতে। কমলা যদি সত্যিই এসে থাকে গ্রামে, তবে এই পেটফোলা মাগিকে লাথি দিয়ে ফেলে নিভন্ত প্রেমের নয়া উস্কানির চরণতলে ঠাঁই নেবে না সমির আলী ?

তখন কী দশা হবে রেজিনার ?

তার গর্ভের শিশুর ?

না! কমলা আসে নি। কই! বাতাসে তো তার আসার গন্ধমাত্র নেই। এই সবই লক্ষ্মীপেঁচার ভুল। এই ভাবনা বুড়ো লাঠিয়ালও ভাবে। সবে সে ক্ষেতের কাজে মন দিয়েছে। এর মধ্যেই উড়ে এসেছে খবর।

ডাক দিয়েছে প্রভাবশালী।

এটা তার সন্ন্যাস হওয়ার আগের ওয়াদা। কমলা যদি সত্যিই মরে না থাকে, তাকে ফালাফালা করার দায়িত্ব বুড়ো লাঠিয়ালের। সে প্রথমে নানা ফিকির খোঁজে। কী করে রক্তপাত না ঘটিয়ে রামদাসকে শায়েস্তা করা যায়। শেষে আঁটঘাট বেঁধে ঘর থেকে বেরোনোর মুখে সন্ধ্যার দোমড়ানো রুমালের মতোন কুণ্ডুলী পাকানো রক্তমেঘ দেখে তার মাথা শিরশির করে।

সমস্ত গ্রাম তখন অব্দি শান্ত।

তাহলে কি কমলা আসে নি ? লক্ষ্মীপেঁচা ভর সন্ধ্যায় আজব খোয়াব দেখেছে ? কুদ্দুস দাওয়ায় বসে অজানা ডরে চমকে ওঠে। লক্ষ্মীপেঁচা এই মাত্র উঠোন

পেরোতে পেরোতে কী বলল ? তার মনে পড়ে যায়, সরষে বনে বাজ পড়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সমির আলীকে। তবে কি সে আগেই খবর পেয়েছে ? কমলা এই গ্রামে জীবন্ত ফিরে এসেছে। লক্ষ্মীপেঁচা ভুল দেখে নি তো ? অমলা রাণীরও এই একই ভ্রম হয়। গেদাকে সে দাস বাড়িতে পাঠিয়েছে বৃত্তান্ত জানার জন্যে। এখন পর্যন্ত তার খবর নেই। অনন্তর খবর নেই। পেঁচাবুড়ি ভুল দেখেছে। কমলা আইলে গেরাম এই রহম সুনসান থাহে ? নাহ্! কমলা আহে নাই।

শাশুড়ি বলে, বেবাকেই আমরার লাহান হপায় খবর হুনছে। কিছু সময় দেখ বউ... কেমন বানের লাহান মানুষ ছোডে।

নাহ! কমলা আসে নি... সমিরও তা-ই ভাবে, এই সবই সন্ধ্যা ছায়ার মায়া কুহক!

আলেয়া আর আঙ্গুরী দাস বাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে বলে, যুদি গিয়া দেহি কমলা নাই ? আল্লাহ! তাই যেন অয়। দাস কাকু বাঁছুক। আর গুড়গুড় করে প্রভাবশালীর আত্মা। প্রতিশোধ স্পৃহা তার রক্তের মধ্যে মরণনাচন নাচে। এইবার দাসকে ফালাফালা করে কমলাকে এমন প্যাঁচে ফেলবে... উত্তেজনায়, টেনশনে ভাবনা ঘুলিয়ে যায় তার। আর যদি লক্ষ্মীপেঁচা ভুল দেখে থাকে ?

না! এই মুহূর্তে এই আশঙ্কা কল্পনায়ও আনা যাচ্ছে না।

রামদাস ডুবে যায় স্মৃতিস্রোতের মধ্যে। আজ সন্ধ্যায়ই কেন এত আকুল হয়ে কমলাকে মনে পড়ছে ? বুকের মধ্যে যক্ষ্মার রক্ত। রাধারাণী কুপি জ্বালিয়ে ছিকা বোনার কাজ রেখে সান্ধ্য উলু দিচ্ছে। মৃত্যু কি ঘনায়মান ? রামদাস ঘরে বসে বাইরের উঠোনে পড়ে থাকা সন্ধ্যার থোকা থোকা রক্ত দেখে। গা ঘষটে ঘষটে সে মাটির উশারায় বসে হুঁকোতে টান দিতে ভুলে যায়। সেই দিন... সে... ই দিন সন্ধ্যার রঙ এমনই ছিল। কেউ কেউ বলছিল আসমানে অত লহু ক্যা ? এইডা কমলার রক্ত। তার আগে চোখের সামনে তারিয়ে তারিয়ে বড় করা কমলা যখন নিরুদ্দেশ হলো... হায় রে কী জহর তার পরের এক হপ্তার মধ্যে! প্রভাবশালীর চাবুকের আলোতে ছিন্নভিন্ন হতে শুরু করল রামদাসের পিঠ, ক' মাইয়ারে কই লুকাইছস ?

amarboi.com

আমি জানি না।

ফের মিছা ?

আহ! আহ! আহ!

গ্রামের বেবাক মানুষ নির্বাক দেখেছিল সেই দৃশ্য। চতুর প্রভাবশালী তখন নিজের লালচের বিষয়টা চেপে গিয়ে দিয়েছিল অন্য ফতোয়া, কমলাকে শহরের বেগানা মানুষের সাথে ভিড়িয়ে দিয়েছে রামদাস... এর বিচার না হলে গ্রামের অন্য বৌ-ঝিরাও সেই পথে যেতে প্রভাবিত হবে।

ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে রামদাস জড়ো হাত ওপরে উঠিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে চিৎকার করেছিল— জানি না। একদিকে সন্তান হারানোর কষ্ট, অন্য দিকে প্রভাবশালীর অত্যাচারে উন্মাদপ্রায় রামদাসকে প্রভাবশালী এক হপ্তা সময় দেয়... এর মধ্যে মেয়ের খোঁজ না দিলে রামদাসকে গ্রাম ছাড়া হতে হবে।

বিছানায় শুয়ে কঁকাতে থাকে রামদাস।

তার রক্ত পিঠে মলম ঘষতে ঘষতে ইনিয়ে বিনিয়ে রাধারাণী ভগবানকে ডাকে, আর কাঁদে। এত যে মাজাভাঙা রামদাস— সেও তখন কমলার যেন মৃত্যু হয় এই অভিসম্পাত করত আর রাধারাণীর কমলাবেদনার কান্নায় মুখে থুতু ছুড়ে মারত— পেডে একটা হাপ ধরছিলি! রাধারাণী ফুঁসে ওঠে, কিতা কন আপনে ? গেরামে থাকলে কিতা অইত অর ? বদমাইস ব্যাডার রক্ষিতা হৈত!

অহন ভালা হৈছে ? খেঁকিয়ে ওঠে রামদাস... লুটা কম্বল গুছাও... গেরাম ছাড়া হৈমু।

কী করলে যে কমলার ভালো হতো, কমলা যে দশায় পড়েছিল, তার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত সে নিলে জুৎসই হতো, এর কিসসু আগামাথা রামদাসও খুঁজে পেত না। তার খালি চামড়া শিরশির করে এইটা মনে পড়ত... প্রভাবশালীর কণ্ঠ— আগুন!

কেন রাধারাণী কুৎসিত একটা মেয়েকে গর্ভে ধারণ করল না ? শেষমেশ এই যন্ত্রণায় পর্যন্ত আফসোসে মরেছে রামদাস।

ভিটেছাড়া হওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি সমাপ্ত।

যতক্ষণি দূর গ্রামের গাঙে মরা লাশ ভেসে উঠার খবর আসে। লাশের গলায় কলসি। জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে তার গলিত দেহকে ডাঙায় উঠিয়েছে।

চকচক করে ওঠে রামদাসের চোখ।

এদিকে কার লাশ কী লাশ না দেখেই রাধারাণী... কমলা... রে এ... এ... এই বুক থাপড়ানো চিৎকারে এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গাঙ বরাবর ছুটতে থাকে। রামদাসও তার পেছন পেছন ছোটে।

মুহূর্তের মধ্যে হুহু করে সারা গ্রামে ছড়িয়ে যায় খবর। মাছির মতো ভনভন গাঙের পাশে। কেউ কাউকে ঠেলে লাশ বরাবর যেতে পারছে না।

রামদাস দেখে সবার সামনে প্রভাবশালী।

ছায়াঘুনসির ফেড়ে পড়ে ভনভন করে ওঠে রামদাসের মাতা... ভগমান! লাশটা কমলার হউক। একটা শুদ নিবার দাও ঠাকুর!

রামদাসকে দেখে সবাই ভিড়ের মধ্যে পথ করে দেয়। দুর্গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ভিড় ঠেলে গলিত লাশটার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় হয়ে রামদাস দেখে খণ্ডখণ্ড মাংসে নরম আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে রাধারাণী কী যেন খুঁজছে।

এই বীভৎস লাশে চেনা মানুষ শনাক্ত করা কঠিন। চতুর্দিকে দম আটকে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্চর্য! মেয়েটির পায়ের পাতাটাই কেবল অক্ষত! রামদাস হামলে পড়ে সেই জায়গাতেই। বুড়ো আঙুলে হাত পড়তেই থেমে পড়ে...

কমলারে... এ... এ... এ... এইবার রামদাসের ভুবন ফাটানো চিৎকার মানুষের আটকে থাকা দমকে নিচের দিকে ফেলতে সাহায্য করে... ওরে রাধারে... দেখ দেখ... ঠ্যাংয়ের তলায় জরুল... বেবাক পইচ্যা গেছে... জরুলডারে যেন রাইখ্যা গেছে অরে চিননের লাইগ্যা।

রাধারাণী হতবাক হয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

রাধারে... এই জরুলে তুই আমি কত চুমা খাইছিরে... ওরে ময়নারে তুই কার ডরে জীবন দিলি...।

প্রভাবশালী বিব্রত।

আমি এর বিছার চাইমু... হাবা রামদাস প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি কোর্ট কাছারি করুম... আমি জানি এইডা কার কাম... জানি... জানি...। প্রচণ্ড রোষময় গ্রামবাসীর লেলিহান আগুন থেকে সেদিন লেজ তুলে পালিয়েছিল প্রভাবশালী।

সেই নারীর চিতার দেহ হাজার হাজার গ্রামবাসী দেখেছিল।

উলু দিয়ে আজ বহুকাল পর কেন যে এই কথাটাই তোলে রাধারাণী! বারান্দায় স্বামীর পাশে বসে লাল রঙ দেখতে দেখতে ফিসফিস করে সে পুরানা পেঁচাল পাড়ে... কমলার ঠ্যাংয়ে তো কুন জরুল আছিল না। হেয় যদি ফের ফির‍্যা আসে ?

আইলে আইব!

রোদে ঝিম ধরা রামদাস এই প্রশ্নে আর রা করে না। সন্তান শোকে রাধারাণী অর্ধেক হয়ে গেছে। মটমট হাড্ডির মধ্যে কেবল চামড়ার আবরণ। আর তব্দা

মেরে গেছে রামদাস। সেইদিন চিতার ঘটনার পর থেকে সে কেবল পূজা আর ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকে। ধীরে ধীরে পালটে যেতে থাকে গ্রামের রূপ। যে কমলাসুন্দরী ছিল গ্রামের যুবক-বৃদ্ধের প্রাণ কাঁপুনি, যার মৃত্যু নিয়ে কয়েক মাস গ্রাম ছিল উত্তপ্ত, পুঁথি কাহিনীতে স্থান পেয়ে যে কমলার কাহিনী গ্রাম গ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই কমলাকে লোকজন ভুলে যেতে শুরু করে। সমির আলী, অনন্ত, এমনকি প্রভাবশালী পর্যন্ত বিবাহ করে। কমলার মৃত্যুর পর প্রভাবশালীর সাথে রামদাসের সম্পর্কের রূপটাই যায় উলটে। ওকে দেখলে প্রভাবশালী থতমত খেয়ে অন্যদিকে চেয়ে থাকেন। আর রামদাস কুঁজো পিঠ সোজা করে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে গঞ্জে যায়। আসমানের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলে আধনেটো উরু খোশটায়।

রামদাস হয়ে উঠেছে প্রভাবশালীর বিষের ফোঁড়া। এর মধ্যে তিনিও সাংঘাতিক মওকা খুঁজেছেন লাশটি আবিষ্কারের পর। চার গ্রামে লোক পাঠিয়েছেন, কমলা বাদে অন্য কোনো নারী নিখোঁজ হয়েছে কি-না। পুরো বিষয়টা রামদাসের নাটক— এটা আবিষ্কার করে তেঁতুল গাছের মোটকা ডালে রামদাসকে ন্যাংটো করে বেঁধে চুতরাপাতা মাখানো বাঁশ দিয়ে পেটাবেন। না, চার গ্রামে আর কোনো নারীর হারানোর হদিস নাই। বুকের ভেতরটা চিড়বিড়িয়ে শীত রক্ত বয়— লাশটার মধ্যে জরুল আবিষ্কার করে যে কান্নাটা দিয়েছে রামদাস... না, না তার সেই অনুগত ভৃত্যর অত বেশি অভিনয় ক্ষমতা নেই। লাশটা কমলারই ছিল।

তা-ও স্বপ্ন-ঘোর গেছে প্রভাবশালীর। অনেকদিন। কী চরম অতৃপ্তি! অত সুন্দর পাকা আমের মতো টসটসে কমলার স্মৃতি বুকে চেপে নয়া বৌকে চুকা চুকা ঠেকেছে। তিনি নয়া বউয়ের মধ্যে দিয়ে পয়লা পয়লা অনেকদিন কমলাকে গ্রহণ করেছেন।

এরপর এক সময় 'কমলা' ধুয়ে মুছে সারা গ্রাম শান্ত হয়ে এসেছে।

এর মধ্যেই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যখন উশারা ছেড়ে মাটির ঘরে গিয়ে বসেছে... অকস্মাৎ দরজায় কার ছায়া... হায়রে ছায়া তো নয়, যেন সাতনরী হারের ঝুনঝুন... রামদাস হাঁ হয়ে সেই ছায়া দেখে।

কিছুক্ষণ কেউ নড়ে না।

কমলাসুন্দরী ?

বিভ্রম... রামদাস চোখ মোছে... এই বিভ্রমে তারা কমলার অন্তর্ধান থেকে শুরু করে এই কিছুক্ষণ আগে লাল রোদ দেখে পর্যন্ত পড়েছে।

দরজার ছায়া নিশ্চল!

সোনার অলঙ্কার! জরির শাড়ি... গালে ঠোঁটে বাহারি রঙ... ক্যাডা গো তুমি ?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে রামদাস।

সেই সজ্জিতা ছায়া কুপির আলোয় আধা মূর্ত হয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বাঁশের থামে হেলান দিয়ে বসে। রাধারাণী বাকরুদ্ধ। সে পিলপিল হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে লাল রক্তরঙ আলো দেখে কেঁপে কেঁপে ছিটকিনি লাগায়।

তুই বাঁইচ্যা আছস... ? ঘটনার আকস্মিকতার মাঝখানে বসে রামদাস ডর ভয় ভুলে কী অনুভূতির মধ্যে নিজেকে ফেলবে, তা খুঁজে পায় না।

রাধারাণী... ঠাকুর ঠাকুর বলে সারাঘরে ধূপ জ্বালায়। সেই আগুন-সুন্দরী সামনেই উপবিষ্ট।

কার লগে কতা কও তুমি ? রাধারাণী ঠেস দেয় স্বামীকে। কে বাঁইচ্যা আছে ?

কমলা গো... কমলা...। লক্ষ্মীপেঁচা কী কৈয়া বেড়াইতেছে হারাগাঁও, হুনো না ? রামদাস খিকখিক হাসে... এইবার চরকি নাচন হৈব... বুড়া লাইঠ্যাল আমার হাড্ডি লৈয়া আধামরণ খেলা খেলব।

কিতা যে কও তুমি! রাধারাণী স্বামীর বুকে কী সব বলে ফুঁ দেয়... বুড়া তো লাড়ি ধরে না। আর হুজুরের কামও করে না...।

রামদাস ঠাণ্ডা মাটিতে কান পেতে বলে, এই শেষ কামডা করব... আর লাড়ি তো ছোড কতা, এইবার চাক্কু শানাইব, কমলা বাঁইচ্যা থাকলে হেয় বুইড়া লাইঠাল দিয়া আমার চামড়া কাটব, জানে মারব না!

কমলা নির্বাক।

না, এই সুসজ্জিতা, ছেনাল চাহনির মেয়ে কমলা নয়। এ অন্য কেউ, এই সিদ্ধান্তে এসে সেই অপ্সরীর সামনে গিয়ে রামদাস প্রশ্ন করে। রাও কর না ক্যান ? কও না তুমি ক্যাডা ? রামদাসের এই প্রশ্নে রাধারাণী বিভ্রান্ত হয়। আসলেই কি অন্য কেউ এসেছে যে কমলার মতোন দেখতে ? তাহলে আর স্বামীর সাথে বাচলামি করার কী আছে ? বাড়িতে স্বর্গের পরীর মতোন একজন কুটুম্ব এসেছে, তাকে ওরা মুড়িগুড় খেতে দিক!

হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে গিয়ে মেঝেতে বিছানো পাটিতে রাধারাণীর হাঁটু পিছলে যায়। বুকের আঁচল খসায় ফকফকা বুকের মধ্যে দুটি চিমসানো স্তনের লাফালাফি। বাইরের রোদ ক্রমশ নিভন্ত। ঘরের কুপি শিখা মেয়ের মুখের সামনে ধরে চিল্লিয়ে ওঠে রাধারাণী... ওরে কমলারে, ওরে ধনরে...।

রামদাস প্রায় ফাল দিয়ে এসে রাধারাণীর মুখ চেপে ধরে।

চুপ!

চৌউপ!

amarboi.com

এরপর কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দিয়ে রাধারাণীকে বিদ্ধ করে সে দম গিলে বলে— বাতাসের কান আছে।

কিতা চাইন আফনে ? রাধারাণী মেয়েকে ফেলে ফের রামদাসের মুখোমুখি হলো, কিতা চাইন ? মাইয়ারে জিগায়া দেখুম, হেয় কিতা চায় ? কুন ধ্যানে হেয় নিউদ্দিস হৈয়া ফের ফির‍্যা আইছে ?

রামদাস থামে হেলান দিয়ে খিকখিক হাসে— জিগায়্যা আর কিতা হৈব, পিডের মইদ্যে বউ কম্বল বান। ওই দেখ দেখ... বলে রামদাস শূন্য উঠোনে কম্পিত আঙুল বাড়ায়, তর বাপেরা আইতাছে... অজানা মাইয়ারে চিতায় উডানির শাস্তি...।

তাইলে আপনে কৈতাছেন, এইডা কমলাই আইছে... বলে রাধারাণী ফের কুপি মেয়ের মুখে ধরতে নিলে কমলা ভাঁজ ভেঙে দাঁড়ায়।

একটি অনড় মূর্তির সঞ্চালনে ঝুনঝুন বেজে ওঠে শরীরের যাবতীয় অলঙ্কার।

কেমন যেন ভয় পায় রামদাস।

রাধারাণীও।

দু'জন ক্রমশ পেছাতে থাকে। মাটিতে রাখা ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে বড় আজব চোখে কমলা পিতা-মাতার দিকে তাকায়। তার চোখের মধ্যে চিরবিদায়ের ছায়া।

সহসা রামদাস-রাধারাণী বুঝে উঠতে পারে না কী করতে যাচ্ছে কমলাসুন্দরী। তারা হাঁ করে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন ইষ্টির ঘরে এসেছিল এরকম একটা পরপর ভাব নিয়ে কমলা পিতা-মাতার প্রস্ফুটিত পাঁজরের হাড় দেখে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

ততক্ষণে চারপাশ আঁধার হয়ে এসেছে। পিতা-মাতার দিকে শেষ চাহনি দিয়ে কমলা ক্রমশ বাইরে জোনাক ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

সমির ভাবে, অনেক হয়েছে আর নয়, এইবার যে কোনোভাবেই হোক নিজেকে টেনে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। সূর্যের মরণ অবস্থা। গোল হয়ে শুধু ডুবে পড়ার অপেক্ষা। শীতের সন্ধ্যায় তার আলো বিকিরণের সাধ্যি নেই বলে চারপাশ সহজেই তমসাময় হয়ে এসেছে।

সব ঝুট হ্যায়... এইভাবে নিজেকে ঝেড়ে যে-ই সে পা বাড়িয়েছে... নিকটবর্তী দূরে কার ছায়া যেন। পুনরায় সমিরের রক্ত জমে যেতে থাকে। সে যেন তার স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের কান্নার শব্দ শুনতে পায়। চারপাশে সহসাই হুহু বাতাস ওঠে। আর মেঘনালা কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে আসমানে অজগর সাপের

রূপ নেয়। পশ্চিম থেকে সরে সূর্য যেন ঠিক এইবার মাঝ আকাশে। কী যেন কী এক সুবাস ছড়াতে থাকে চারপাশে, যার ঘোরে কেমন নেশা ধরে যায়। এছাড়া সারা গ্রামে কী যেন কী রব... কুয়াশামণ্ডলীর মাঝখানের ক্ষীণ কায়া পথ ধরে আসছে। সমির কান পাতে, পাখির কলআওয়াজ নয়তো ? না! না! মানুষের গুঞ্জন। যে গুঞ্জনে সমস্ত গ্রামবাসী গাঙের পাড়ের লাশের সামনে এক হয়েছিল। সারা গ্রামের বাতাসের মধ্যে তারই চাপা এক রূপের গুঞ্জন।

সমিরের বুকের রক্ত ডান থেকে বাঁয়ে সরে যায়।

সম্মুখে কমলাসুন্দরী।

যেন কমলা নয়, সন্ধ্যার রক্তে ফণা তুলেছে বিকট এক গোখরো। হিসহিসে মুখে বসা সূর্যটা আচমকা কমলাসুন্দরীর মাথার মধ্যে আলো ফেলে। যেন কমলা ভূমিষ্ঠ হয়েছে সূর্যের গর্ভ থেকে, মুহূর্তে সূর্য অপ্সরী হয়ে ওঠা কমলাকে দেখে তা-ই মনে হয় সমির আলীর। ওর দিকে চেয়ে থাকে সমির।

হি... হি... হি... চুড়ির শব্দের মতো প্রেত হাসি ছড়াতে থাকে সান্ধ্য আলোর পরতে পরতে। ভুরুতে ফের কটাক্ষ তুলে, ঠোঁটে শ্লেষ আর ঘেন্না মিশ্রিত হাসি ঝুলিয়ে কমলা একটা রঙিন রুমাল সমিরের দিকে ছুড়ে দেয়। সূর্য যেন দু'হাত বাড়িয়ে কমলাকে কোলে তুলে নিতে চায়। চমকে সমির গলায় ঝুলে থাকা রুমালটার দিকে তাকিয়ে দেখে, সেটা এক লকলকে সাপ হয়ে সমিরের কণ্ঠনালি পেঁচাতে শুরু করেছে। ভূমণ্ডল ফাটিয়ে আর্তচিৎকার দিয়ে নিচে ঢলে পড়তে পড়তে সন্ধ্যার শেষ আলোয় সমির দেখে সারা গ্রামের মানুষঢল রামদাসের বাড়ির দিকে ছুটছে।

সামনে কমলাসুন্দরী নেই। সূর্য ডুবে গেছে। তারই অসীম গর্ভে ঢুকে গেছে কমলার শেষ ছায়াটুকু।

নুসরাতের ভাবনা মিথ্যা।

দেউরিতে স্থির থাকা পা নিজ অজান্তে নিজের অবস্থান, অস্তিত্ব সব ভুলিয়ে নুসরাতকে কমলাসুন্দরীর বাড়ির দিকে ধাবিত করে। কমলা যদি না-ই আসবে, গেরামের বেবাক মানুষ রামদাসের বাড়ির দিকে ছুটছে কেন ?

অনন্ত ফিরে এসেছে।

অমলা রাণীর বাড়িতে নতুন ক্রন্দন। তার শাশুড়ির ভাবনাই ঠিক। সাঁতার কেটে ঠিক অনন্ত ফিরে এসেছে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পাওয়া ছেলের ধিকধিক কলিজা বাড়ি আসার পরপরই যে কমলার খবর পেয়ে আসমানে উড়াল দিতে চাইবে, তা কে জানত ?

ছেলেকে বেদিশা অবস্থা থেকে টেনে তার ডানা চেপে অমলা রাণী রামদাসের বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

লক্ষ্মীপেঁচা সারা গ্রামে মুহূর্তের মধ্যে খবর ছুটিয়ে এক দল গ্রামবাসীর সাথে সাথে রামদাসের বাড়িমুখো ছুটছে। বাঁ-হাতে লুঙ্গি চেপে হনহন হাঁটতে থাকা প্রভাবশালীর শরীর থেকে এই কঠিন শীতেও ঘাম জমছে। সে বলে, এইবার দাসের খেল খতম! গাঙ পাড়েই আমার সন্দেহ হৈছিল...।

ন্যাংটো লাঠিয়াল মাথার ওপর বনবন লাঠি ঘুরিয়ে বলে, আগে অরে বস্তাতে ভরতে অইব, যাতে লহু না ঝরে।

প্রভাবশালী উত্তেজিত স্বরে বলে, রক্ত না ঝরায়া, না খুন কইরা খুন করনের কায়দা কি তর নয়া ?

ওরে চুতমারানি রামদাসের বাচ্চা, ঘরের মইদ্যে থাইক্যা তর নখরা বেটিরে লৈয়া বাইর হ।

বিচরণশীল কুয়াশা শুধু।

অন্ধকার শুধু।

এইসবকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে চাওয়া অর্ধমৃত সূর্যের চেষ্টা শুধু। ওই ব্যাটা রামদাস, বাইর হ— প্রভাবশালীর গর্জন ঢলের মতো রামদাসের বাড়ির দিকে আসতে থাকা কৌতূহলী মানুষের রোমকূপ পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। শীত। এর মধ্যে রাঙা বাতাসের ঝাপটানি। রামদাসের খড়ের চালে উঠে যাওয়া শিম গাছটির ফুলে ফড়িংয়ের ওড়াউড়ি।

ভয়ে আশঙ্কায় উত্তেজনায় দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর খাচ্ছে সবাই। ভিড়ের মধ্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত অমলা রাণীকে অনন্ত টেনে ভিটের বাইরে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগের মৃত্যুর গহীন কূপ থেকে সাঁতরে বেরিয়ে আসার দুঃসহ যন্ত্রণা আর আনন্দ ধুয়ে মুছে গেছে কমলাসুন্দরীর আগমনের খবরে। এখন কমলা আর রামদাসের কী হাল করেন প্রভাবশালী, সেইটা দেখার অপেক্ষা।

ছোট্ট একটা উঠোন। সব মানুষ কি ধরে ? মানুষের ধাক্কায় রামদাসের উঠোনের ডালিম গাছ, বেড়া সব ভেঙে তছনছ।

বেশ্যাডারে ঘর থাইক্যা লৈয়া বাইর হ দাসের বাচ্চা, প্রভাবশালীর শেষ হুঙ্কারে আঁধার ছায়া ঘর থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে আসে রামদাস আর রাধারাণী। ওদের বারান্দায় দেখে তাতানো আগুন এক্কেবারে আসমান ছুঁয়ে জ্বলে ওঠে— কারে তুই চিতায় উডাইছিলি মালাউনের বাচ্চা, কুন মুসলমান বেটিরে ? কে তর মাইয়ারে খুন করছিল ? গাঙের পাড়ে নাটক করনের সময় কার ইঙ্গিত করছিলি ?

নুসরাত বানু নিজের অস্তিত্ব ভুলে ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ খোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর কী দেখতে হবে এই উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে শেষে জনতার কোলে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে।

amarboi.com

নুসরাতের এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড অস্বস্তিতে বিভ্রান্ত বোধ করে গ্রামবাসী। পেছনের কাণ্ড দেখার মতোন অবস্থা প্রভাবশালীর নেই। সবার সামনে বুড়ো লাঠিয়াল। এই প্রচণ্ড শীতেও তার খোলা শরীর ঘামছে।

মাথার ওপর ভনভন ঘোরাচ্ছে লাঠি।

কিন্তু আশ্চর্য! এখন কমলার আগমনের দৃশ্যটাই প্রকটভাবে জেঁকে ধরছে রামদাসকে। পেছন দরজা দিয়ে কমলাসুন্দরীর বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা সে ঘোরের মধ্যে বসে কল্পনা করছে, এমন বোধ হতে থাকে তার।

ফলে সবার সামনে মাথা নুয়ে আসে রামদাসের। ওই গিদরের বাচ্চা! অহন কতা কস না ক্যা ?

তখনই রাধারাণী বিলাপ দিয়ে কেঁদে ওঠে— কই কমলা ? কী কৈতাছেন আপনেরা ? কী দেখবার আইছেন ? কমলার ভূত নাকি ?

অন্ধকার উঠোনে শত মানুষের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। ভিড়ের গুঞ্জনকে আরো প্রকট করে ঝনঝন বেজে ওঠে লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠ— ওতো কমলা না! কমলার জিন। আমি তেঁতুল গাছের তলে দেখছি! কী তার রূপ! কী তার সাজ!

সবার দেহে মুহূর্তের জন্য নীল স্রোত বয়ে যায়। রাধারাণীর বিলাপ আর থামে না। বাঁইচ্যা থাকতে মাইয়াডারে লৈয়া বহুত গঞ্জনা সইজ্য করছি আমরা। আইজ মরাডারে লৈয়াও জবাব দেওন লাগব ? কই কমলা ? কিতা হৈছে আইজ নয়া কৈরা ? বাইর করেন কমলারে... নাইলে আমিও দাসের বৌ, আমার মরা মাইয়া লৈয়া হাঙ্গামা করলে আমি কেউরে ছারতাম না।

আকাশের ওপরের কুণ্ডুলী পাকানো মেঘ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। আর সেই ছোবলের আঘাতে আঘাতে গহীন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সূর্য, আর কঠিন শীত, আর গভীর ছায়া। ক্রমঘনায়মান ভুতুড়ে রাত্তির। হতভম্ব হয়ে পড়েন প্রভাবশালী।

বুড়ো লাঠিয়াল এক দৌড়ে ঢুকে পড়ে রামদাসের ঘরে। সেদিন গাঙ পাড়ে রামদাসের কান্নামিশ্রিত তেজ দেখে যে মানুষগুলোর গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা আজ গভীর বিস্ময়ে দেখে, এখন দ্বিগুণ তেজ দেখানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কী এক ঘোরে পড়ে রামদাস মাথা নেড়ে নেড়ে কাঁদছে— কমলারে আমি নিজ হাতে পুড়াইছি! বিশ্বাস করেন আপনেরা! বিশ্বাস করেন... অর লাশ আমি নিজ চক্ষে দেখছি... ওর বাঁও ঠ্যাংগে একটা জরুল আছিল।

—